# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম

হুমায়ূন আহমেদ

। হিমু সমগ্র ।

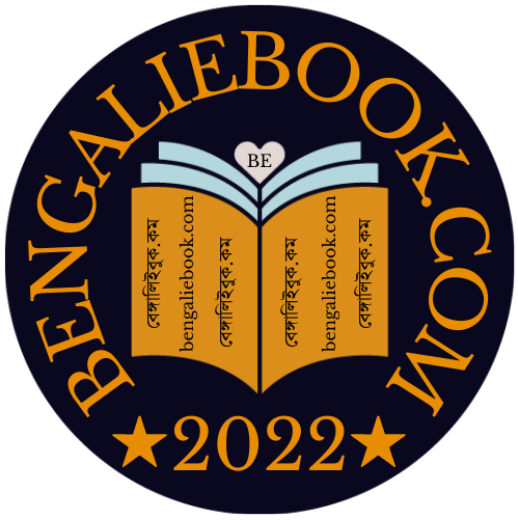

# সূচিপত্র

হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০১ ..... 2
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০২ ..... 17
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০৩ ..... 31
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০৪ ..... 45
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০৫ ..... 53
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০৬ ..... 66
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০৭ ..... 79
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০৮ ..... 98
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ০৯ ..... 113
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ১০ ..... 119
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ১১ ..... 125
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ১২ ..... 134
হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম - ১৩ (শেষ) ..... 145

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০১

আজকের দিনটা এত সুন্দর কেন?

সকালবেলা জানালা খুলে আমি হতভম্ব। এ কী! আকাশ এত নীল! আকাশের তো এত নীল হবার কথা না। ভূমধ্যসাগরীয় আকাশ হলেও একটা কথা ছিল। এ হচ্ছে খাটি বঙ্গদেশীয় আকাশ, বেশিরভাগ সময় ঘোলা থাকার কথা। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই জানালার ওপাশে একটা কাক এসে বসল। কী আশ্চর্য! কাকটাকেও তো সুন্দর লাগছে। কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে হাটছে। কলেজে ভরতি হবার পরদিন যে-ভঙ্গিতে কিশোরী মেয়েরা হাটে অবিকল সেই—"বড় হয়ে গেছি" ভঙ্গি। আমি মুগ্ধ হয়ে কাকটাকে দেখলাম। কাকের চোখ এত কালো হয়? কবি-সাহিত্যিকরা কি এই কারণেই বলেন কাকচক্ষু জল? আচ্ছা, আজ সব সুন্দর সুন্দর জিনিস চোখে পড়ছে কেন আজকের তারিখটা কত? দিন-তারিখের হিসাব রাখি না, কাজেই তারিখ কত বলতে পারছি না। একটা খবরের কাগজ কিনে তারিখটা দেখতে হবে । মনে হচ্ছে আজ একটা বিশেষ দিন । আজকের দিনটার কিছু-একটা হয়েছে। এই দিনে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটবে। পৃথিবী তার রূপের দরজা আজকের দিনটার জন্যে খুলে কাজেই আজ সকাল থেকে জীবনানন্দ দাশ-মার্কা হাঁটা দিতে হবে-"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে"-মার্কা হাটা। আমি ধড়মড় করে বিছানা থেকে নামলাম । নষ্ট করার মতো সময় নেই। কাকটা বিক্ষিত গলায় ডাকল–কা-কা। আমার ব্যস্ততা মনে হয় তার ভালো লাগছে না। পাখিরা নিজেরা খুব ব্যস্ত থাকে, কিন্তু অন্যদের ব্যস্ততা পছন্দ করে না ।

মাথার উপর ঝাঁঝালো রোদ, লু-হাওয়ার মতো গরম হাওয়া বইছে। গায়ের হলুদ পাঞ্জাবি ঘামে ভিজে একাকার। পাঞ্জাবি থেকে ঘামের বিকট গন্ধে নিজেরই নাড়িভুড়ি উলটে আসছে, তার পরেও আজকের দিনটার সৌন্দর্যে আমি অভিভূত। হঠাৎ কোনো বড় সৌন্দর্যের মুখোমুখি হলে স্নায়ু অবশ হয়ে আসে। সকাল থেকেই আমার স্নায়ু অবশ হয়ে আছে। এখন তা আরও বাড়ল, আমি দাড়িয়ে পড়লাম । সৌন্দর্যের কথাটা চিৎকার করে সবাইকে জানাতে ইচ্ছা করছে। মাইক ভাড়া করে রিকশা নিয়ে শহরে ঘোষণা দিতে পারলে চমৎকার হতো ।

হে ঢাকা নগরবাসী। আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ ৯ই চৈত্র, ১৪০২ সাল। দয়া করে লক্ষ্য করুন। আজ অপূর্ব একটি দিন। হে ঢাকা নগরবাসী! হ্যালো হ্যালো, মাইক্রোফোন টেস্টিং। ওয়ান টু থ্রি ফোর। আজ ৯ই চৈত্র, ১৪০২ সাল...

আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি রাস্তার ঠিক মাঝখানে । বিজয়সরণির বিশাল রাস্তা- মাঝখানে দাড়ালে কোনো অসুবিধা হয় না। রিকশা গাড়ি সব পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। তার পরেও লক্ষ্য করলাম কিছু-কিছু গাড়ির ড্রাইভার বিরক্তচোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে, বিড়বিড় করছে- নির্ঘাত গালাগালি। গাড়ির মানুষেরা মনে করে পাকা রাস্তা বানানো হয়েছে শুধুই তাদের জন্যে। পথচারীরা হাটবে ঘাসের উপর দিয়ে, পাকা রাস্তায় পা ফেলবে না । রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাড়িয়ে আমার বেশ চমৎকার লাগছে। নিজেকে ট্রাফিকপুলিশ বলে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে পাজেরো-টাইপ দামি কোনো গাড়ি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলি– দেখি লাইসেন্সটা! ইনসিওরেন্সের কাগজপত্র আছে? ফিটনেস সার্টিফিকেট? এক্সহষ্ট দিয়ে ভকভক করে কালো ধোয়া বেরুচ্ছে। নামুন গাড়ি থেকে! আজকের দিনটা এমন যে মনের ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ পূর্ণ হলো। একটা পাজেরো গাড়ি আমার গা-ঘেঁষে হুড়মুড় করে থামল ।

লম্বাটে চেহারার এক ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মাথা বের করে বললেন, হ্যালো ব্রাদার, সামনে কি কোনো গণ্ডগোল হচ্ছে? আমি বললাম, কী গণ্ডগোল?

'গাড়ি-ভাঙাভাঙি হচ্ছে নাকি?'

'জি না ।"

পাজেরো হুশ করে বের হয়ে গেল। পাজেরো হচ্ছে রাজপথের রাজা। এরা বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। কেমন গাম্ভীর্য নিয়ে চলাফেরা করে। দেখতে ভালো লাগে। মনে হয় 'আহা, এরা কী সুখেই-না আছে!' পরজন্মে মানুষের যদি গাড়ি হয়ে জন্মানোর সুযোগ থাকত—আমি পাজেরো হয়ে জন্মাতাম।

পাজেরোর ভদ্রলোক গাড়ি-ভঙাভাঙি হচ্ছে কিনা কেন জানতে চেয়েছেন বুঝতে পারছি না। আজ হরতাল, অসহযোগ এইসব কিছু নেই। দুদিনের ছাড় পাওয়া গেছে। তৃতীয় দিন থেকে আবার শুরু হবে। আজ আনন্দময় একটা দিন। হরতালের বিপরীত শব্দ কী? আনন্দতাল'? সরকার এবং বিরোধীদল সবাই মিলে একটা বিশেষ দিনকে আনন্দতাল ঘোষণা দিলে চমৎকার হতো। সকাল-সন্ধ্যা আনন্দতাল । সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব খুলে যাবে- সবাই সবার গাড়ি নিয়ে হর্ন বাজাতে বাজাতে রাস্তায় নামবে। রাস্তার মোড়ে পুলিশ এবং বিডিআর থাকবে না। থাকবে তাদের ব্যান্ডপার্টি। এরা সারাক্ষণ ব্যান্ড বাজাবে। তাদের দিকে পেট্রোল বোমার বদলে গোলাপের তোড়া ছুড়ে দেয়া হবে...

'হিমু ভাই না?'

আমি চমকে তাকালাম । গাঢ় মেরুন রঙের একটা গাড়ি আমার পাশে থেমেছে। গাড়ির চালকের সিটে যে বসে আছে তাকে দেখাচ্ছে পদ্মিনি গোত্রের কোনো তরুণীর বয়সে এই মেয়ের মতোই ছিল । কিং সোলায়মান বিলকিসকে দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। আমারও অভিভূত হওয়া উচিত। অভিভূত হতে পারছি না- কারণ মেয়েটিকে চিনতে পারছি না। চেনা-চেনাও মনে হচ্ছে না। এ কে?

হিমু ভাই, আমাকে চিনতে পারছেন না?

‘এখন পারছি না, তবে চিনে ফেলব।’

‘আমি মারিয়া!”

ও আচ্ছা, মারিয়া। কেমন আছেন?’

‘আপনি চিনতে পারেননি। চিনতে পারলে আপনি করে বলতেন না ।’

‘ও চিনেছি–তুই এত বড় হয়েছিস আশ্চর্য! যাকে বলে পারফেক্ট লেডি। ঠোঁটে লিপষ্টিক-ফিপস্টিক দিয়ে তো দেখি ব্যাড়াছাড়া করে ফেলেছিস!’

আপনি এখনও চেনেননি। চিনলে তুই-তুই করে বলতেন না। তুই বলার মতো ঘনিষ্ঠতা আপনার সঙ্গে আমার ছিল না।’

‘ছিল না বলেই যে ভবিষ্যতেও হবে না তা তো না! ভবিষ্যতে হবে ভেবে তুই বললাম।’

‘আপনি রাস্তার মাঝখানে দাড়িয়ে কী করছেন?’

কিছু করছি না।’

‘অবশ্যই কিছু করছেন। দূর থেকে মনে হলো হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। পাগল-টাগল হয়ে যানি তো? শুনেছি পাগলেরা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেয় ট্রাফিক কন্ট্রোল করে।’

‘এখনও পাগল হইনি। তবে মনে হচ্ছে শিগ্‌গিরই হবো। তুই নিজেও গাড়ি নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছিস। লোকে তোকেও মহিলা-পাগল ভাবছে।’

‘তুই-তুই করবেন না। কেউ তুই-তুই করলে আমার ভালো লাগে না। আপনি কি আসলেই আমাকে চিনতে পারছেন

না?’

‘কেউ আমাকে চিনতে না পারলেও আমার ভালো লাগে না । যা-ই হোক, সামনে কি গণ্ডগোল হচ্ছে? গাড়ি-টাড়ি ভাঙা হচ্ছে?’

'না।'

'কেউ আমাকে চিনতে না পারলেও আমার ভালো লাগে না। যা-ই হোক, সামনে কি গণ্ডগোল হচ্ছে? গাড়ি-টাড়ি ভাঙা হচ্ছে?'

'না। পাজেরোর মালিকরা অতি সাবধানি হয় । গণ্ডগোলের ত্রিসীমানায় তারা থাকে না ! পাজেরো যখন গিয়েছে তখন তোমার গাড়িও যেতে পারবে।'

'গাড়ি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই বলে আপনি এরকম কথা বলতে পারলেন। আমার গাড়িটা পাজেরোর চেয়ে অনেক দামি । এটা রেসিং কার।'

'চড়তে কি খুব আরাম?'

'চড়তে চান?'

'হুঁ, চাই ।

'তা হলে উঠে আসুন।'

আমি গাড়ির পেছনের দিকে উঠতে যাচ্ছিলাম—অবাক হয়ে দেখলাম, এই গাড়ির দুটামাত্র সিট। হাত-পা এলিয়ে পিছনের সিটে বসার কোনো উপায় নেই। বসতে হবে ড্রাইভারের পাশে। মারিয়া বলল, সিটবেল্ট বাঁধুন।

আমি বললাম, সিটবেল্ট বাধতে পারব না। দড়ি দিয়ে বাঁধাছাঁদা হয়ে গাড়িতে বসতে ইচ্ছা করে না । গাড়িতে যাব আরাম করে। আমি কি গরু-ছাগল যে আমাকে বেঁধে রাখতে হবে।

'কথা বাড়াবেন না হিমু ভাই, সিটবেল্ট বাঁধুন। আমি খুব দ্রুত গাড়ি চালাই। অ্যাক্সিডেন্ট হলে সর্বনাশ ।' 'এইরকম গিজগিজ ভিড়ে তুমি দ্রুত গাড়ি চালাবে কী করে?'

'শহরের ভেতরে ভিড়–বাইরে তো ভিড় না। আমি ঢাকা-চিটাগাং হাইওয়েতে চলে যাব। দুশো কিলোমিটার স্পিড দিয়ে গাড়িটা কেমন পরীক্ষা করব। কেনার পর থেকে আমি গাড়ির স্পিড পরীক্ষা করতে পারিনি।'

আমি শুকনো গলায় বললাম, ও আচ্ছা।

মারিয়া গাড়ি চালানোয় খুব ওস্তাদ আমার এরকম মনে হচ্ছে না। হুটহাট করে ব্রেক কষছে। সাজগোজের দিকে যে-মেয়ের এত নজর অন্যদিকে তার নজর কম থাকার কথা। পরনে লালপাড় হালকা রঙের শাড়ি। (শাড়ি পরে গাড়ি চালাচ্ছে কী করে? এক্সিলেটরে চাপ না পড়ে শাড়িতে পা বেঁধে যাবার কথা ) গলায় লাল রঙের পাথরের লকেট। সবচে বড় পাথরটা পায়রার ডিমের সাইজ। কী পাথর এটা? পাথরের নাম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই মারিয়া এমনভাবে ব্রেক কষল যে উইন্ডশিল্ডে আমার মাথা লেগে গেল। মারিয়া বলল, সিটবেল্ট থাকায় বেঁচে গেলেন। সিটবেল্ট বাধা না থাকলে মাথার ঘিলু বেরিয়ে যেত।

'মারিয়া!'

'জি?'

'তুমি কত স্পিডে গাড়ি চালাবে বললে?'

'দুশো কিলোমিটার–একশো পঁচিশ মাইল পার আওয়ার।'

'আমার এখন মনে পড়ল-আমি তো তোমার সঙ্গে যেতে পারব না। খুব জরুরি একটা কাজ আছে জিপিওতে। আসগর নামে এক লোক আছে– জিপিওর সামনে বসে থাকে, লোকজনদের চিঠি লিখে দেয় । সে খবর পাঠিয়েছে তার সঙ্গে যেন দেখা করি । আমার খুব বন্ধুমানুষ ।'

'আমি দুশো কিলোমিটার স্পিডে গাড়ি চালাব এটা শুনেই আপনি আসলে আমার সঙ্গে যেতে ভয় পাচ্ছেন ।' 'খানিকটা তা-ই। ভয় পাওয়াটা তো দোষের না— তোমার মতো একজন আনাড়ি ড্রাইভার যদি দুশো কিলোমিটার স্পিড দেয়, তা হলে আমার ধারণা গাড়ি রাস্তা ছেড়ে আকাশে উঠে যাবে।'

মারিয়া বলল, সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা না ।

‘আমাকে নামিয়ে দাও । আসগর সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা না করলেই না ।’

‘আপনাকে আমি নামিয়ে দিতাম। কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারেননি এই অপরাধের শাস্তি হিসেবেই আমি নামাব না।’

‘যদি চিনে ফেলতে পারি তা হলে নামিয়ে দেবে?’

‘হ্যা, নামিয়ে দেব।”

‘তোমার মা’র নাম কী?’

‘মা’র নাম, বাবার নাম কারো নামই বলব না। মা-বাবাকে দিয়ে আমাকে চিনলে হবে না। আপনি আমাকে দিয়ে ওদের চিনবেন।’

“তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা কবে হয়েছিল?’

‘পাঁচ বছর আগে।’

“এখন তোমার বয়স কত?

‘কুড়ি।’

‘পাচ বছর আগে বয়স ছিল পনেরো।’

‘অঙ্কশাস্ত্র তা-ই বলে।’

‘এইজন্যেই চিনতে পারছি না। পনেরো বছরের কিশোরী পাঁচবছরে অনেকখানি বদলে যায়। শুয়োপোকা থেকে প্রজাপতি হবার ব্যাপারটা এর মধ্যেই ঘটে।’

‘ফর ইওর ইনফরমেশন, আমি কখনোই শুয়োপোকা ছিলাম না। জন্ম থেকেই আমি প্রজাপতি ।’

‘তোমাদের বাসাটা কোথায়?’

“তাও বলব না ।”

‘তোমাদের বাসায় আমি প্রায়ই যেতাম?’

‘একসময় যেতেন। গত পাঁচ বছর যাননি।’

'কেন যেতাম?'

'আমার এক সময় ধারণা ছিল আমাকে দেখার জন্যে যেতেন। এখন সেই ভুল ভেঙেছে।'

'ও, তুমি আসাদুল্লাহ সাহেবের মেয়ে- মরিয়ম।'

'মরিয়ম না, মারিয়া। আপনি মরিয়ম ডাকতেন, রাগে গা জ্বলে যেত। এখনও জ্বলে যাচ্ছে ।'

খ্যাচ করে শব্দ হলো । গাড়ি রাস্তার উপর থেমে গেল। মরিয়ম বলল, নেমে যান। আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন, কাজেই পূর্বচুক্তি অনুযায়ী নামিয়ে দিচ্ছি।

'না, নামাতে হবে না, শুরুতে তোমাকে যতটা আনাড়ি ড্রাইভার মনে হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না।'

'লং ড্রাইভের সঙ্গী হিসেবে আপনাকে আমার মনে ধরছে না। ঘামের গন্ধে আমার দম আটকে আসছে।'

'তোমার বাবা কেমন আছেন?'

'ভালো না। বেশিদিন বাঁচবেন বলে মনে হয় না। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। উনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন। আপনার কোনো ঠিকানা আমাদের জানা নেই বলে আপনার সঙ্গে যেগাযোগ করতে পারিনি।'

'ঠিকানা দিচ্ছি, ঠিকানা লিখে রাখো ।'

'কোনো দরকার নেই। আপনি কখনো এক ঠিকানায় বেশিদিন থাকেন না। আমাকে ঠিকানা দিয়েই আপনি বাসা বদল করে ফেলবেন।'

'তা হলে তোমাদের টেলিফোন নাম্বারটা দাও । আমি টেলিফোনে খোজ নেব।'

'টেলিফোন নাম্বার আপনাকে দিয়েছি। নাম্বার যেন ভুলে না যান সেই ব্যবস্থাও আমি করেছিলাম- একটু চিন্তা করলেই নাম্বার মনে পড়বে। আরেকটা কথা- আমার ধারণা,

আপনি প্রথম দেখাতেই আমাকে চিনেছিলেন। তার পরও না-চেনার ভান করেছেন । আপনি একটা অন্যায় করেছেন। বলুন সরি।'

'সরি।'

'কিশোরী বয়সে গভীর আবেগ নিয়ে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম- আপনি চিঠির জবাব দেননি।'

'সাংকেতিক ভাষায় লেখা চিঠি। পাঠোদ্ধার করতে পারিনি।'

'আবারও একটা মিথ্যা কথা বললেন। পাঠোদ্ধার আপনি ঠিকই করেছিলেন । পাঠোদ্ধার করেই আপনি গেছেন ঘাবড়ে। আর আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আসেননি।'

'তা না, নানান ঝামেলা গেল— আমার দূর সম্পর্কের এক বোন মারা গেল... কিডনি ফেইলিওর ।'

'হিমু ভাই, আপনি কি সবসময় মিথ্যা কথা বলেন?'

'তা বলি।'

'আমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমি আমার কুড়ি বছর জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলিনি।'

'কষ্ট করে আর পাঁচ বছর যদি মিথ্যা না বলে থাকতে পার তা হলে মহিলামহাপুরুষ হয়ে যাবে। শুধুমাত্র মহাপুরুষরাই ২৫ বছর মিথ্যা না বলে থাকতে পারেন।'

মারিয়া শুকনো গলায় বলল, মহাপুরুষ-বিষয়ক এই তথ্য জানতাম না। শিখে রাখলাম । আমি বললাম, আবার ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলাও মহাপুরুষদের লক্ষণ । সাধারণ মানুষ কখনো ক্রমাগত মিথ্যা বলতে পারে না- এটাও শিখে রাখো।

'হিমু ভাই, আমি যাচ্ছি–'

মারিয়া গাড়ি নিয়ে হুশ করে বের হয়ে গেল। মাথায় এখন আর রোদ লাগছে না। অল্প সময়ের ভেতরে কোথেকে মেঘ এসে জমা হওয়া শুরু হয়েছে। আমি আকাশের মেঘের

দিকে তাকালাম- আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম রাস্তায় । ফাকা-ফাক রাস্তা। রিকশা চলছে, গাড়ি খুব কম। অন্তবর্তীকালীন সরকারের আন্দোলন শুরু হয়েছে। দুই আপোসহীন নেত্রীর চাপে পড়ে বেচারা গাড়িগুলি পড়েছে বিপদে। যেখানে-সেখানে গাড়ি ভাঙা হচ্ছে। এখনও বোধহয় কোথাও শুরু হয়েছে। এইসব খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাবধানি গাড়ি-মালিকরা তাদের গাড়ি দ্রুত সরিয়ে ফেলেন। আমি কিছুক্ষণ কান পেতে রইলাম বোমার আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। পাওয়া যাচ্ছে না। সময়টা এমন যে বোমার আওয়াজ পাওয়া না গেলে অস্বস্তি লাগে । মনে হয়- ব্যাপারটা কী? সমস্যা কি গুরুতর? বোমার আওয়াজ পাওয়া গেলে মনে হয়- সব ঠিক আছে। সমস্যা তেমন গুরুতর না ।

আমি হাঁটতে হাঁটতে জিপিওর দিকে যাচ্ছি। মারিয়ার কথা এই মুহূর্তে আর ভাবছি না। মস্তিস্কের যে-অংশে মারিয়ার স্মৃতি জমা করা ঐ অংশের সুইচ অফ করে দিয়েছি। এখন ভাবছি আসগর সাহেবের কথা । ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। আজ এই চমৎকার দিনে দেখা করে আসা যাক । ওনার সঙ্গে দেখা করার সমস্যা একটাই । যান | কিছু-কিছু নিমন্ত্রণ এমনভাবে করা হয় যে 'না' করা যায় না।

রাস্তার লোকজনদের সচকিত করে পরপর দুটা পুলিশের জিপ চলে গেল। তার পেছনে সাইরেন বাজাতে বাজাতে এক অ্যাম্বুলেন্স। বোঝাই যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে কোনো রোগী নেই। পেছনের সিটে কয়েকজন ভদ্রলোক মিলে গল্প করছেন। একজনের হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। তিনি জানালা দিয়ে মুখ বের করে ধোঁয়া ছাড়ছেন। অথচ অ্যাম্বুলেন্সে সাইরেন যেভাবে বাজছে তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই ভালোমন্দ কিছু ঘটে যাবে।

'ভাইসাহেব, শুনুন!'

অপরিচিত গোলগাল মুখের এক লোক গায়ে হাত দিয়ে আমাকে ডাকছেন। আমি অ্যাম্বুলেন্সের দিক থেকে চোখ সরিয়ে গোলগাল মুখের এই ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম।

উনি বাজার করে ফিরছেন। বাজারের ব্যাগের ভেতর থেকে লাউয়ের মাথা বের হয়ে আছে । চৈত্রমাসের লাউ খেতে কেমন কে জানে!

'হ্যালো ব্রাদার!'

'আমাকে বলছেন?'

'জি। একটা গুজব শুনলাম, শহরে আর্মি নেমেছে— সত্যি নাকি?'

'জানি না ।"

'খুবই অথেন্টিক গুজব। আর্মি নেমেছে- হেভি পিটুনি শুরু করেছে।'

'যাকে পাচ্ছে তাকেই পেটাচ্ছে?"

'প্রায় সেরকমই।'

লাউ-হাতে ভদ্রলোককে খুবই আনন্দিত মনে হলো । আর্মি যাকে পাচ্ছে তাকে পেটাচ্ছে এতে এত আনন্দিত হবার কী আছে কে জানে। ভদ্রলোক তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, গর্ত থেকে সাপ টেনে বের করলে সাপ কি ছেড়ে দেবে?

আমি বললাম, আর্মিকে সাপ বলছেন আর্মি জানতে পারলে আপনার লাউ নিয়ে যাবে। এবং আপনাকেও হেভি পিটুনি দেবে।

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হলেন । আমি বুঝতে পারছি ভদ্রলোক এখন মনে মনে নিজেকেই গালি দিচ্ছেন- 'কেন গায়ে পড়ে আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম!'

হাতে ঘড়ি নেই- অনুমান তিনটা থেকে সাড়ে তিনটায় জিপিওতে ঢুকলাম। মূল গেট তালাবদ্ধ। দেয়াল টপকে ঢুকতে হলো । বাইরে সিরিয়াস গণ্ডগোল। চলন্ত বাসে আগুনবোমা ছোড়া হয়েছে। বাসের ভেতরটা ঝলসে গেছে। পুলিশ, বিডিআর চলে এসেছে। টিয়ার-গ্যাস মারা হচ্ছে। রাস্তায় কিছু কাপড়ের দোকান ছিল— সেগুলি লুট হচ্ছে। ভদ্রটাইপের লোকজনদের দেখা যাচ্ছে চার-পাঁচটা শার্ট বগলে নিয়ে মাথা নিচু করে দ্রুত চলে যাচ্ছে। বাসায় ফিরে স্ত্রীকে হয়তো বলবে— 'খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম। আন্দোলনে

একটা লাভ হয়েছে- চাল-ডালের দাম বাড়লেও গার্মেন্টসের কাপড়চোপড় জলের দামে বিক্রি হচ্ছে। চারটা শার্ট দাম পড়েছে মাত্র পঞ্চাশ টাকা। ভাবা যায়!"

চূড়ান্ত রকম গণ্ডগোলের ভেতরও আসগর সাহেবকে পাওয়া গেল নির্বিকার অবস্থায় । তিনি টুলবক্স নিয়ে বসে আছেন। টুলবক্সের গায়ে লেখা–

আলি আসগর

পত্রলেখক ।

পোষ্টকার্ড ১ টাকা

খাম ২ টাকা

রেজিস্ট্রি ৫ টাকা

পার্সেল ২৫ টাকা (দেশি)

পার্সেল ৫০ টীকা (বিদেশি)।

আসগর সাহেবের বয়স ৬০-এর কাছাকাছি হলেও বেশ শক্তসমর্থ। দেখে মনে হয় কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে জীবনযাপন করেন। চিঠি লেখা তেমন কোনো শ্রমের কাজ না, তার পরেও ভদ্রলোকের চেহারায় পরিশ্রমের এমন প্রবল চাপের কারণ কী— কে বলবে! আসগর সাহেব একজনকে চিঠি লিখে দিচ্ছেন। আমি আসগর সাহেবের পাশে গিয়ে বসলাম । তিনি একবার তাকালেন- আবার চিঠি লেখা শুরু করলেন। ভদ্রলোকের হাতের লেখা মুক্তার মতো । দেখতেও ভালো লাগে । আমার চিঠি লেখার কেউ থাকলে ওনাকে দিয়ে লেখাতাম। কে জানে ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে পরিচয় হলে মারিয়ার চিঠির জবাব হয়তো দিতাম। তাঁকে দিয়েই লেখাতাম– প্রিয় মারিয়া, তোমার সাংকেতিক ভাষায় লেখা চিঠির মর্ম উদ্ধার করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই ... কী সর্বনাশ, মারিয়ার কথা ভাবা শুরু করেছি! সুইচ অফ করা ছিল- কখন আবার অন হলো? ব্রেইন কি অটো সিস্টেমে

চলে গেছে? আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলালাম। যে চিঠি লেখাচ্ছে তার দিকে তাকালাম ।

যে চিঠি লেখাচ্ছে তাকে অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে। খালি পা, লুঙ্গি পরা। গায়ে নীল রঙের একটা গেঞ্জি। বেচারার হয়তো জ্বর এসেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে। যেভাবে সে গড়গড় করে চিঠির বিষয়বস্তু বলে যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় সে দীর্ঘদিন ধরে অন্যকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে দেশে পাঠাচ্ছে ।

প্রিয় ফাতেমা,

দোয়াগো। পর সমাচার এই যে, আমি আল্লাপাকের অসীম রহমতে মঙ্গলমতো আছি। তোমাদের জন্যে সর্বদা বিশেষ চিন্তাযুক্ত থাকি...

আসগর সাহেব চিঠি লেখা বন্ধ রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাইসাব, রাতে আমার সাথে চারটা খানা খান ।

আমি বললাম, আজ না খেলে হয় না?

‘কাজকর্ম থাকলে রাত করে আসেন। কোনো অসুবিধা নাই। আজ বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের বাজার করব, আপনাকে নিয়ে চারটা ভালোমন্দ খাব। অনেকদিন ভালোমন্দ খাই না।’

‘জি আচ্ছা ।’

‘এখন কি একটু চা খাবেন?’

‘খেতে পারি এক কাপ চা।’

আসগর সাহেব হাত উচিয়ে চাওয়ালাকে চা দিতে ইশারা করে আবার চিঠি লেখায় মন দিলেন। আমি চা খেয়ে জিপিওর বাইরে এসেই পুলিশের হাতে ধরা খেলাম ।

পুলিশের হাতে ধরা খাওয়ার ব্যাপারে সবসময় নাটকীয়তা থাকে- এখানে তেমন নাটকীয়তা ছিল না। রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বেশ আগ্রহ নিয়ে বাসপোড়া দেখছি। বাসের সবকটা জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে–পট পট পট পট শব্দ হচ্ছে । কেউ আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে না, বা বাসের চারদিকে ছোটাছুটিও করছে না। আমি অপেক্ষা করছি কখন ধোঁয়া বের হওয়া শেষ হয়ে সত্যিকার আগুন জ্বলবে। মোটামুটি রকমের আগুন জ্বললে সেই আগুনে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে রওনা হওয়া যেতে পারে। বাসপোড়া-আগুনে সিগারেট ধরানো একটা ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হবার কথা । আমি সিগারেট-হাতে অপেক্ষা করছি ।

এমন সময় শার্ট-প্যান্ট-পরা এক লোক এসে আমার সামনে দাড়ালেন। ভদ্র চেহারার, কথাবার্তাও ভদ্র। আমাকে বললেন, আপনার ব্যাগে কী?

আমার কাধে চটের ব্যাগ । সেই ব্যাগে কয়েকটা টাকা এবং কিছু খুচরা পয়সা । আমার পাঞ্জাবির কোনো পকেট নেই। জরুরি জিনিসপত্রের জন্যে পুরানো আমলের কবিদের মতো কাধে ব্যাগ ঝোলাতে হয় ।

আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললাম, ব্যাগ খালি ।

ভদ্রলোক এবার গলার স্বর কঠিন করে বললেন, খালি কেন? মাল ডেলিভারি দিয়ে ফেলেছেন? 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কোন মালের কথা বলছেন?'

'ব্যাগে জর্দার কৌটা ছিল না?'

'জি না, আমি তো পান খাই না।'

ভদ্রলোক বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আপনার পান খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।

বলেই খপ করে আমার হাত ধরলেন। এর নাম বজ্র আঁটুনি । হাতের দুটা হাড়- রেডিও এবং আলনা মটমট করতে লাগল। যে-কোনো সময় ভেঙে যাবার কথা । এই ভদ্রলোক হাত ধরার ট্রেনিং কোথায় নিয়েছে? সারদা পুলিশ অ্যাকাডেমিতে?

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। নতুন পরিস্থিতির কারণে দিনের সৌন্দর্য কি কমে গেছে? দেখলাম, কমেনি। চারদিক এখনও অপূর্ব লাগছে। দিনের শেষের রোদে নগরী ঝলমল করছে। রোদের নিজস্ব একটা গন্ধ আছে। তেজি চনমনে গন্ধ । আমি অনেকদিন পর রোদের গন্ধ পেলাম। যে-পুলিশ অফিসার আমার হাত ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছেন তাকেও ক্ষমা করে দিলাম। এমন সুন্দর দিনে কারও উপর রাগ রাখতে নেই।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০২

'আপনার নাম কী?'

আমি ইতস্তত করছি, নাম বলব কি বলব না ভাবছি। কেউ নাম জিজ্ঞেস করলে আমরা সাধারণত খুব আগ্রহের সঙ্গে নাম বলি। জিজ্ঞেস না করলেও বলি। হয়তো বাসে করে যাচ্ছি- পাশে অপরিচিত এক ভদ্রলোক। দুএকটা টুকটাক কথার পরই হাসিমুখে বলি, ভাইসাহেব, আমার নাম হচ্ছে এই... আপনার নামটা?

মানুষ তার এক জীবনে যে-শব্দটি সবচেয়ে বেশি শোনে তা হচ্ছে তার নিজের নাম । পৃথিবীর দ্বিতীয় মধুরতম শব্দ খুব সম্ভব "ভালোবাসি"।

'কী ব্যাপার নাম বলছেন না কেন? প্রশ্ন কানে যাচ্ছে না?'

'স্যার যাচ্ছে ।'

'তা হলে জবাব দিচ্ছেন না কেন?'

আমি খুকুকক করে কাশলাম। অস্পষ্ট ধরনের কাশি । নার্ভাসনেস কাটানোর জন্যে এজাতীয় কাশি পৃথিবীর আদিমানব বাবা আদমও আড়চোখে বিবি হাওয়ার দিকে তাকিয়ে কেশেছিলেন। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে বারোটা- এই সাড়ে সাত ঘণ্টা আমি রমনা থানার এক বেঞ্চে বসে ছিলাম। আমি একা না, আমার সঙ্গে আরও লোকজন ছিল । তারাও আমার মতো ধরা খেয়েছে। এক এক করে তারা ওসি সাহেবের সঙ্গে ইন্টারভিউ দিয়েছে। কেউ ছাড়া পেয়েছে, কেউ হাজতে ঢুকে গেছে। আমার ভাগ্যে কী ঘটবে বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে আমি বসে আছি ওসি সাহেবের সামনে । জেরা করতে করতে ভদ্রলোক এখন মনে হচ্ছে কিছুটা ক্লান্ত । ঘনঘন হাই তুলছেন। খাকি পোশাক পরা মানুষদের হাই তোলার দৃশ্য অতি কুৎসিত। দেখতে ভাল লাগে না। এরা সবসময় স্মার্ট হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসবেন— ভদ্রলোক বসেছেন বাকা হয়ে । বসার ভঙ্গি দেখে

মনে হয় গত সপ্তাহে পাইলসের অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের ঘা শুকায়নি। ওসি সাহেবের চেহারায় রসকষ নেই, মিশরের মমির মতো শুকনো মুখ। সেই মুখও খানিকটা কুঁচকে আছে। মনে হচ্ছে পাইলস ছাড়াও ওসি সাহেবের তলপেটে ক্রনিক ব্যথা আছে। এখন সেই ব্যথা হচ্ছে। তিনি ব্যথা সামাল দিতে গিয়ে মুখ কুঁচকে আছেন। খাকি পোশাক না পরে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরলে তাকে কেমন লাগত তা-ই ভাবছি। ঠিক বুঝতে পারছি না। কোনো এক ঈদের দিনে এসে ওনাকে দেখে যেতে হবে। সুযোগ-সুবিধা থাকলে কোলাকুলিও করব । পুলিশের সঙ্গে কোলাকুলির সৌভাগ্য এখনও হয়নি ।

'বলুন, নাম বলুন। মুখ সেলাই করে বসে থাকবেন না।'

আমি আবারও কাশলাম । খাকি পোশাক পরা কাউকে আসল নাম বলতে নেই। তাদের বলতে হয় নকল নাম। ঠিকানা জিজ্ঞেস করলে ভুল ঠিকানা দিতে হয়। বাসা যদি হয় মালিবাগ তা হলে বলতে হয় তল্লাবাগ । হিমু নামের বদলে তাকে ঝিমু বললে কেমন হয়? অনেক্ষণ ঝিম ধরে আছি, কাজেই ঝিমু। সবচে ভালো হয় শত্রু-টাইপ কারোর নাম-ঠিকানা দিয়ে দেয়া । তেমন কারও নাম মনে পড়ছে না।

নাম শোনার জন্যে ওসি সাহেব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। এবার তার ধৈর্যচ্যুতি হলো। খাকি পোশাক পরা মানুষের ধৈর্য কম থাকে। উনি তাও মোটামুটি ভালোই ধৈর্য দেখিয়েছেন।

'নাম বলছেন না কেন? নাম বলতে অসুবিধা আছে?'

'জি না স্যার ।'

'অসুবিধা না থাকলে বলুন- ঝেড়ে কাশুন ।'

আমি ঝেড়ে কাশলাম, বললাম, হিমু।

'আপনার নাম হিমু?'

'ইয়েস স্যার।'

'আগেপিছে কিছু আছে, না শুধুই হিমু?'

'শুধুই হিমু। বাবা হিমালয় নাম রাখতে চেয়েছিলেন। শর্ট করে হিমু রেখেছেন।'

শর্ট যখন করলেনই আরও আরও শর্ট করলেন না কেন? শুধু 'হি' রেখে দিতেন।'

'কেন যে 'হি' রাখলেন না আমি তো স্যার বলতে পারছি না। উনি কাছে ধারে থাকলে জিজ্ঞেস করতাম।'

'উনি কোথায়?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারছি না কোথায় । খুব সম্ভব সাতটা দোজখের যে-কোনো একটায় তার স্থান হয়েছে।'

ওসি সাহেবের কোঁকানো মুখ আরও কুঁচকে গেল। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক রেগে যাচ্ছেন। খাকি পোশাক পরা মানুষকে কখনো রাগাতে নেই।

'আপনার ধারণা আপনার বাবা দোজখে আছেন?'

'জি স্যার। ভয়ংকর পাপী মানুষ ছিলেন। দোজখ-নসিব হবারই কথা । উনি ঠাণ্ডা মাথায় আমার মা'কে খুন করেছিলেন। ৩০২ ধারায় কেইস হবার কথা । হয়নি। আমার তখন বয়স ছিল অল্প। তা ছাড়া বাবাকে অত্যন্ত পছন্দ করতাম।'

'আপনার ঠিকানা কী? স্থায়ী ঠিকানা ।'

'স্যার, আমার স্থায়ী ঠিকানা হলো পৃথিবী। দা প্ল্যানেট আর্থ।'

ওসি সাহেব সেক্রেটারিয়েট টিবিলের মতো একটা টেবিলের ওপাশে বসে আছেন। তিনি আমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে এলেন । তার মুখ ভয়ংকর দেখাচ্ছে। মনে হয় তলপেটের ক্রনিক ব্যথাটা তার হঠাৎ বেড়ে গেছে। তিনি থমথমে গলায় বললেন, ত্যাদড়ামি করছ? রোলারের এক ডলা খেলে ত্যাদড়ামি বের হয়ে যাবে। রোলার চেন?

'জি স্যার, চিনি।'

'আমার মনে হয় ভালো করে চেন না।'

পুলিশের লোকেরা যেমন অতি দ্রুত তুমি থেকে আপনিতে চলে যেতে পারে তেমনি অতিদ্রুতই আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে তুই-এ নেমে যেতে পারে। এই বেশ খাতির করে সিগারেট দিচ্ছে, লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে, হঠাৎ মুখ গভীর করে তুমি শুরু করল, তার পরই গালে প্রচণ্ড থাবড়া দিয়ে শুরু করল তুই। তখন চোখে অন্ধকার দেখা ছাড়া গতি নেই।

আমি শঙ্কিত বোধ করছি। ওসি সাহেব হঠাৎ করে আপনি থেকে তুমিতে চলে এসেছেন— লক্ষণ শুভ নয়। গালে থাবড়া পড়বে কি না কে জানে! আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

‘তোমার স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে পৃথিবী। দা প্ল্যানেট আর্থ?’

‘ইয়েস সার ।’

‘বোমা কি ভাবে বানায় তুই জানিস?’

আমি আঁতকে উঠলাম- তুমি থেকে তুই-এ ডিমোশন হয়েছে। লক্ষণ খুব খারাপ। চার নম্বর বিপদ-সংকেত। ঘূর্ণিঝড় কাছেই কোথাও তৈরি হয়ে গেছে। এইদিকে চলে আসতে পারে। সমুদ্রগামী সকল নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হচ্ছে।

‘কী, কথা আটকে গেছে যে? বোমা বানাবার পদ্ধতি জানিস? বোমা বানাতে কী কী লাগে?’

‘নির্ভর করছে কী ধরনের বোমা বানাবেন তার উপর। অ্যাটম বোমা বানাতে লাগে ক্রিটিকাল মাসের সমপরিমাণ বিশুদ্ধ ইউরোনিয়াম টু থাটি ফাইভ। ফ্রি নিউট্রানের সঙ্গে বিক্রিয়া শুরু হয়...’

‘জর্দার কৌটা কীভাবে বানায়?’

‘জর্দার কৌটা-টাইপ বোমা বানাতে লাগে— পটাশিয়াম ক্লোরেট, সালফার, কার্বন এবং কিছু পটাশিয়াম নাইট্রেট। ক্ষেত্রবিশেষে ইয়েলো ফসফরাস ব্যবহার করা হয়। তবে ব্যবহার না করলেই ভালো। ইয়েলো ফসফরাস ব্যবহার করলে আপনা-আপনি বোমা ফেটে যাবার

আশঙ্কা থাকে। মনে করুন, আপনি জর্দার কৌটা পকেটে নিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ সম্পূর্ণ বিনা কারণে পকেটের বোমা ফেটে যাবে। ভয় পেয়ে আপনি দৌড়ে থানায় এসে দেখবেন, আপনার এই পা উড়ে চলে গেছে। প্রচন্ড টেনশনের জন্যে আপনি এক পায়েই দৌড়ে চলে এসেছেন। বুঝতে পারেননি?'

ওসি সহেব হুংকার দিলেন, রসিকতা করবি না ত্যাঁদড়ের বাচ্চা, লেবু কচলে যেমন রস বের করে- মানুষ কচলেও আমরা রস বের করি ।

এইটুকু বলেই তিনি পেছন দিকে তাকিয়ে চাপাগলায় ডাকলেন, আকবর, আকবর !

আকবর কে, কে জানে! আমি ঝিম ধরে আকবরের জন্যে অপেক্ষা করছি। সাধারণত রাজা-বাদশার নাম বয়-বাবুর্চির মধ্যে বেশি দেখা যায়। চাকরবাকর, বয়বাবুর্চিদের নামের সত্তর ভাগ জুড়ে আছে- আকবর, শাহজাহান, জাহাঙ্গির, সিরাজ ।

আমার অনুমান সত্যি হলো । আকবর বাদশা বের হয়ে এলেন। তার বয়স বারোতেরো। পরনে হাফপ্যানট। গায়ে হলুদ গেঞ্জি । আকবর বাদশা সম্ভবত ঘুমুচ্ছিলেন। ঘুম এখনও কাটেনি। ওসি সাহেব হুংকার দিলেন, হেলে পড়ে যাচ্ছিস কেন? সোজা হয়ে দাঁড়া ।

আকবর সোজা হয়ে দাঁড়াল। পিটপিট করে চারদিক দেখতে লাগল। ওসি সাহেব বললন, চা বানিয়ে আন । হিমু সাহেবকে ফাস ক্লাস করে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়া ।

আকবর মাথা অনেকখানি হেলিয়ে সায় দিল । কয়েকবার চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে বিকট হাই তুলল। সে যেভাবে হেলতে দুলতে যাচ্ছে তাতে মনে হয় পথেই ঘুমিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে।

ওসি সাহেব আমার দিকে ফিরলেন। তিনিও অবিকল আকবরের মতো হাই তুলতে তুলতে বললেন, হিমু সাহেব, আপনি চা খান। চা খেয়ে ফুটেন। ফুটেন শব্দের মানে জানেন তো?

'জানি স্যার । ফুটেন হচ্ছে পগারপার হওয়া ।'

'দ্যাটস রাইট। চা খেয়ে পগারপার হন। আর ত্যাঁড়ামি করবেন না।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসলাম। ওসি সাহেব আপনি থেকে তুই-তে নেমে আবার আপনি-তে ফিরে গেছেন । চা-টা খাওয়াচ্ছেন। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। এত বোঝাবুঝির কিছু নেই। চা খেয়ে দ্রুত বিদেয় হয়ে যাওয়াটা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। এই জগতের অদ্ভুত কাণ্ডকারকানা বোঝার চেষ্টা খুব বেশি করতে নাই। জগৎ চলছে, সূর্য

উঠছে-ডুবছে, পূর্ণিমা-অমাবস্যা হচ্ছে তেমনি অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাও ঘটছে। ঘটতে থাকুক-না। সব বোঝার দরকার কী! বরফ জলে ভাসে। বরফও পানি, জলও পানি। তার পরেও একজন আরেকজনের উপর দিব্যি ভেসে বেড়াচ্ছে। ভেসে বেড়ানোটা ইন্টারেস্টিং। তার পেছনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা তেমন ইন্টারেস্টিং না।

মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, কিন্তু কোনো বাতাস লাগছে না। থানার ভেতরটা ফাকাফাকা। এক কোনায় টেবিলে ঝুঁকে বুড়োমতো এক ভদ্রলোক বসে আছেন। বেশ নির্বিকার ভঙ্গি। পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে হচ্ছে। এই যে ওসি সাহেবের সঙ্গে আমার এত কথা হলো, তিনি একবারও ফিরে তাকাননি । থানার বাইরের বারান্দায় লম্বা বেঞ্চি পাতা। সেখানে কয়েকজন পুলিশ বসে আছে। তাদের গল্পগুজব, হাসাহাসি কানে আসছে। থানার লকারে মুসল্লি-টাইপ কোনো ক্রিমিন্যালকে রাখা হয়েছে। সে বেশ উচ্চস্বরে নানান দোয়া-দরুদ পড়ছে। তার গলা বেশ মিষ্টি ।

আমি চায়ের জন্যে অপেক্ষা করছি এবং 'ত্যাঁদড়' শব্দের মানে কী তা ভেবে বের করার চেষ্টা করছি । ত্যাঁদড়ের বাচ্চা বলে গালি যেহেতু প্রচলিত, কাজেই ধরে নেয়া যেতে পারে ত্যাঁদড় কোনো-একটা প্রাণীর নাম । বাঁদরজাতীয় প্রাণী কি? বাঁদর যেমন বাঁদরামি করে, ত্যাঁদড় করে ত্যাঁদরামি। ওসি সাহেবকে ত্যাঁদড় শব্দের মানে কি জিজ্ঞেস করা ঠিক হবে? উনি রেগে গিয়ে আবার আপনি থেকে তুই-এ নেমে যাবেন না তো? এই রিস্ক নেয়া কি ঠিক হবে? ঠিক হবে না। তারচে বরং বাংলা ভালো জানে এমন কাউকে জিজ্ঞেস করে

জেনে নেয়া যাবে। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। মারিয়ার বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তিনি পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। মারিয়ার তা-ই ধারণা ।

আকবর বাদশা চা নিয়ে এসেছে। যেসব জায়গার নামের শেষে স্টেশন যুক্ত থাকে সেসব জায়গার চা কুৎসিত হয়- যেমন বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, পুলিশ স্টেশন। অদ্ভুত কাণ্ড- আকবর বাদশার চা হয়েছে অসাধারণ এক চুমুক দিয়ে মনে হলো- গত পাচ বছরে এত ভালো চা খাইনি। কড়া লিকারে পরিমাণমতো দুধ দিয়ে ঠিক করা হয়েছে। চিনি যতটুকু দরকার তারচে সামান্য বেশি দেয়া হয়েছে। মনে হয় এই 'বেশি'র দরকার ছিল। গন্ধটাও কী সুন্দর! চায়ে যে আলাদা গন্ধ থাকে তা শুধু রূপাদের বাড়িতে গেলে বোঝা যায়। তবে রূপাদের বাড়ির চায়ে লিকার থাকে না । খেলে মনে হয় পীরসাহেবের পানিপড়া খাচ্ছি। আমি আকবর বাদশার চায়ে গভীর আগ্রহে চুমুক দিচ্ছি। আকবর বাদশা আমার সামনে দাড়িয়ে ক্রমাগত হাই তুলে যাচ্ছে। সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কেন বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় চা শেষ হবার পর কাপ হতে নিয়ে বিদেয় হবে, যদিও এমন কোনো মুল্যবান চায়ের কাপ না । বদখত ধরনের কাপ| খানিকটা ফাটা । ফাটা কাপে চা খেলে আয় কমে–খুব সুদর কাপে চা খেলে নিশ্চয়ই আয়ু বাড়ে। রূপাদের বাড়িতে চা খেয়ে আয়ু বাড়াতে হবে। ওদের বাড়িতেই পৃথিবীর সবচে সুন্দর কাপে চা দেয়া হয়।

অসি সাহেব বললেন, চা-টা কেমন লাগল?

আমি বললাম, স্যার ভালো।

'কেমন ভালো?'

'খুব ভালো । অসাধারণ! জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো '

'কোন কবিতা?"

আমি গম্ভীর গলায় আবৃত্তি করলাম :

এইসব ভালো লাগে : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়, আমার কাতর চোখ, আমার বিমর্ষ ম্লান চুল–

এই নিয়ে খেলা করে জানে সে যে বহুদিন আগে আমি করেছি কি ভুল পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালবেসে,

ওসি সাহেব বললেন, আরেক কাপ খাবেন?

'জি না ।'

'কবিতার মতো চা যখন— গোটা পাঁচ-ছয় কাপ খান।'

'পরের কাপটা হয়তো ভালো হবে না। আমার ধারণা চা এখানে ভালো হয় না। আজ হঠাৎ করে হয়ে গেছে। স্টাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটির ভেতর পড়ে গেছে। স্ট্যাটিসটিক্যাল প্রবাবিলিটি বলে, এক লক্ষ কাপ চা যদি বানানো হয় তা হলে এক লক্ষ কাপ চায়ের ভেতর এক কাপ চা হবে অসাধারণ।'

ওসি সাহেব থমথমে গলায় বললেন, সায়েন্স কপচাবি না। সায়েন্স গুহ্যদ্বার দিয়ে ঢুকিয়ে দেব।

আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, 'জি আচ্ছা স্যার।'

'এখন বল, তোদের বোমা বানাবার কারখানাটা কোথায়? সাঙ্গোপাঙ্গদের নাম বল । পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝেড়ে কাশবি, নয়তো ঠেলার চোটে চা যে খেয়েছিস, সেই চা নাকমুখ দিয়ে বের হবে। শুরু কর।'

কী সর্বনাশের কথা- আমার ব্রহ্মতালু শুকিয়ে ওঠার উপক্রম হলো! এ কী সমস্যায় পড়া গেল! ওসি সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, নিজ থেকে কথা বলতে চাইলে ভালো কথা, নয়তো রোলারের গুতা দিয়ে সব বের করব। নাভির এক ইঞ্চি উপরে একটা গুতা

দিলে আর কিছু দেখতে হবে না। গত জন্মের কথাও বের হয়ে আসবে। আমি শুকনো গলায় বললাম, সার, একটা টেলিফোন করতে পারি?

ওসি সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে কাকে টেলিফোন করবি? কোনো মন্ত্রীকে? পুলিশের আইজিকে? আর্মির কোনো জেনারেলকে? টেলিফোন এবং সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান— তোকে অ্যারেস্ট করার জন্য ধমক খেতে খেতে আমার অবস্থা কাহিল হবে–বদলি করে দেবে চিটাগাং হিলট্র্যাক্টে? শান্তিবাহিনীর বোমা খেয়ে চিত হয়ে পড়ে থাকব?

'স্যার, আমি খুবই লোয়ার লেভেলের প্রাণী। প্রায় শিম্পাঞ্জিদের কাছাকাছি। হাইয়ার লেভেলের কাউকে চিনি না ।'

'তা হলে কাকে টেলিফোন করতে চাচ্ছিস?'

'এমন কাউকে টেলিফোন করব যে আমার চরিত্র সম্পর্কে আপনাকে একটা সার্টিফিকেট দেবে!'

'ক্যারেকটার সার্টিফিকেট?'

'জি ।'

'তোর টেলিফোনের পর হোম মিনিস্টার আমাকে ধমকাধমকি করবে না?'

'জি না স্যার । সম্ভাবনা হচ্ছে, একটা মেয়ে খুব মিষ্টি গলায় আপনাকে আমার সম্পর্কে দুএকটা ভালো কথা কলবে।'

'মেয়েটি কে? প্রেমিকা?'

'জি না। আমি লোয়ার লেভেলের প্রাণী, প্রেম করার যোগ্যতা আমার নেই। প্রেম অতি উচ্চস্তরের ব্যাপার ।'

'তোর যোগ্যতা কী?'

'আমার একমাত্র যোগ্যতা আমি হাঁটতে পারি। কেউ চাইলে ছায়ার মতো পাশে থাকি । আমি হচ্ছি স্যার ছায়াসঙ্গী।'

ওসি সাহেব গম্ভীর মুখে টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। থানার ঘড়িতে রাত একটা বাজে। কাকে টেলিফোন করব বুঝতে পারছি না। রূপাকে করা যায়। এত রাতে টেলিফোন করলে রূপা ধরবে না। রূপার বাবা ধরবেন এবং আমার নাম শুনেই খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখবেন । ফুপুর বাসায় করা যায়। ফুপু টেলিফোন ধরবেন। ঘুম-ঘুম স্বরে বলবেন, কে, হিমু? কী ব্যাপার?

আমি ব্যাপার ব্যাখ্যা করার পর তিনি হাই তুলতে তুলতে বলবেন, তোকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে এটা তো নতুন কিছু না। প্রায়ই ধরে। রাতদুপুরে টেলিফোন করে বিরক্ত করছিস কেন?

এই দুইজন ছাড়া আর কাউকে টেলিফোন করা সম্ভব না, কারণ আর কারও টেলিফোন নাম্বার আমি জানি না। মারিয়াকে করব? এমিতেও ওর খোজ নেয়া দরকার। দুশো কিলোমিটার স্পিডে চলার পর কী হলো? পৌছতে পেরেছে তো ঢাকায়? পথে কোনো বোমা-টোমা খায়নি? মারিয়ার টেলিফোন নাম্বারটা মনে করতে হবে। পাচ বছর আগে একটা পদ্ধতি শিখিয়েছিল । অ্যাসোসিয়েশন অব আইডিয়া পদ্ধতি। নাম্বারটা হচ্ছে প্রথমে আট- তারপর আমি, তুমি, আমি, তুমি আমরা। আমি হচ্ছে, ১, তুমি হচ্ছে ২, আমরা হচ্ছে ৩; তা হলে নাম্বারটা হল ৮১২ ১২৩ । ভয়াল করতেই পাশ থেকে মারিয়া ধরল। আমি খুশিখুশি গলায় বললাম, কেমন আছিস?

মারিয়া বিস্মিত হয়ে বলল, কেমন আল্লাল আপনি কে? হু আর ইউ?

'আমি হিমু।'

'রাত একটার সময় কেন?'

'খোঁজ নেবার জন্যে— তোর দুশো কিলোমিটার স্পিডে ভ্রমণ কেমন হলো?'

'রাত একটার সময় সেটা টেলিফোন করে জানতে হবে?'

'তোর টেলিফোন নাম্বার মনে আছে কি না সেটাও ট্রাই করলাম। এক কাজে দু কাজ |'

‘এখনও তুই-তুই করছেন?’

‘আচ্ছা, আর করব না।’

‘কোথেকে টেলিফোন করছেন?”

‘রমনা থানা থেকে । পুলিশের ধারণা আমি বোমা-টোমা বানাই। ধরে নিয়ে এসেছে। এখন জেরা করছে।’

‘ধোলাই দিয়েছে?’

‘এখন ও দেয়নি। মনে হয় দেবে। তুই কি একটা কাজ করতে পারবি? ওসি সাহেবকে মিষ্টি গলায় বলবি যে বোমা-টোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি অতি সাধারণ, অতি নিরীহ হিমু। একটুর জন্যে মহাপুরুষ হতে গিয়ে হতে পারিনি।’

‘আপনি তো সারাজীবন নানান ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছেন–পুলিশের হাতে ধরা খাওয়া তো ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা। বের হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন?’

‘এক জায়গায় একটা দাওয়াত ছিল । বলেছিলাম রাত করে যাব। ভদ্রলোক নাখেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন।’

‘ভদ্রলোকের টেলিফোন নাম্বারটা দিন। টেলিফোন করে বলে দিচ্ছি আপনি পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছেন। আসতে পারবেন না।’

‘তোর কি ধারণা বাংলাদেশের সবার ঘরেই টেলিফোন আছে?’

‘হিমু ভাই, আপনি এখনও কিন্তু তুই-তুই করছেন। কেন করছেন তাও আমি জানি। মানুষকে বিভ্রান্ত করে আপনি আনন্দ পান। কখনো তুমি, কখনো তুই বলে আপনি আমাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। একসময় আমি নিতান্তই একটা কিশোরী ছিলাম । বিভ্রান্ত হয়েছি। বিভ্রান্ত হবার স্টেজ আমি পার হয়ে এসেছি। অনেক কথা বলে ফেললাম। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলব না। রাখি?’

‘আচ্ছা- তুই এত রাত পর্যন্ত জেগে কী করছিলি?’

'গান শুনছিলাম।'

'কার গান?'

'নীল ডায়মন্ড । গানের কথা শুনতে চান?'

'বল।'

'What a beautiful noise
coming out from the street
got a beautiful sound
its got a beautiful beat
its a beautiful noise.'

কথা তো শুনলেন। এখন তা হলে রাখি?'

'আচ্ছা।'

'খট শব্দ করে মারিয়া টেলিফোন রেখে দিল ।'

ওসি সাহেব বললেন, টেলিফোনে কোনো মন্ত্রী-মিনিস্টার পাওয়া গেল?

'জি না ।'

'আপনার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবে এমন কাউকেও পাওয়া গেল না?'

ওসি সাহেব আবার তুই থেকে আপনি-তে চলে এসেছেন। জোয়ারভাটার খেলা চলছে। খেলার শেষ কী কে জানে। ওসি সাহেব বললেন, কী, কথা বলুন, সুপারিশের লোক পাওয়া গেল না?

'একজনকে পেয়েছিলাম, সে সুপারিশ করতে রাজি হলো না।'

'খুবই দুঃসংবাদ ।'

'জি, দুঃসংবাদ ।'

'আমাদের থানার রেকর্ড অফিসার বলল, আপনাকে এর আগেও কয়েকবার ধরা হয়েছে।'

‘উনি ঠিকই বলেছেন। আমি নিশাচর প্রকৃতির মানুষ তো- রাতে হাঁটি । রাতে যারা হাটে পুলিশ তাদের পছন্দ করে না । পুলিশের ধারণা রাতে হাটার অধিকার শুধু তাদেরই আছে।’

‘বিটের কনস্টেবলরা বলছিল আপনার নাকি আধ্যাত্মিক ক্ষমতা আছে। সত্যি আছে নাকি?’

‘নেই স্যার। হাঁটার ক্ষমতা ছাড়া আমার অন্য কোনো ক্ষমতা নেই।’

‘রোলারের দুই গুতা জায়গামতো পড়লে আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বের হয়ে যায়।’

‘যথার্থ বলেছেন স্যার ।’

‘আপনার প্রতি আমি সামান্য মমতা অনুভব করছি। কেন বলুন তো?’

‘আমার কোনো আধ্যাত্মিক ক্ষমতা নেই– থাকলে সেই ক্ষমতা অ্যপ্রাই করে আমার মতো অভাজনের প্রতি আপনার মমতার কারণ বলে দিতে পারতাম ।’

‘আপনার প্রতি মমতা বোধ করছি, কারণ আমার জানামতে আপনি হচ্ছেন থানায় ধরে-আনা প্রথম ব্যক্তি, যার পক্ষে কথা বলার জন্যে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশ এমন এক দেশ, যে-দেশে পুলিশের হাতে কেউ ধরা পড়লেই মন্ত্রী-মিনিস্টার, সেক্রেটারি, মিলিটারি জেনারেলের একটা সাড়া পড়ে যায়। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসতে থাকে। শুনুন হিমু সাহেব, চলে যান। আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি।’

‘থ্যাংক য়্যু স্যার।’

‘যাবেন কিভাবে?’ গাড়ি-রিকশা সবই তো বন্ধ!’

‘হেঁটে হেঁটে চলে যাব। কোনো সমস্যা নেই।’

‘আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে। পুলিশের জীব দিচ্ছি, আপনি যেখানে যেতে চান নামিয়ে দেবে । যাবেন কোথায়?’

‘কাওরান বাজার। আসগর নামের এক ভদ্রলোকের বাসায় আমার দাওয়াত।’

‘যান, দাওয়াত খেয়ে আসুন।’

আমি পুলিশের জিপে উঠে বসলাম। সেন্ট্রি-পুলিশ আমাকে তালেবর সাইজের কেউ ভেবে স্যালুট দিয়ে বসল। রোলারের গুতার বদলে স্যালুট। বড়ই রহস্যময় দুনিয়া ।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০৩

পুলিশের গাড়ি আমাকে কাওরান বাজার নামিয়ে দিয়ে গেল। ড্রাইভারের গায়েও খাকি পোশাক । সে বেশ আদবের সঙ্গে গাড়ির দরজা খুলে আমাকে নামতে সাহায্য করল। তার পরই এক স্যালুট। আমি অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকালাম- কেউ দেখে ফেলছে না তো? পুলিশ আদবের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামাচ্ছে, স্যালুট দিচ্ছে- খুবই সন্দেহজনক। রাত প্রায় দুটা- কারও জেগে থাকার কথা না। আন্দোলনের সময় সারাদিন লোকজন ব্যস্ত থাকে । টেনশানঘটিত ব্যস্ততা । রাত দশটায় ভয়েস অভ আমেরিকার খবর শোনার পর সবার মধ্যে খানিকটা ঝিমঝিম ভাব চলে আসে । আন্দোলনের খবর যত ভয়াবহই হোক, সবাই খুব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে চলে যায়। দেশে কোনো আন্দোলন চলছে কি না তা বোঝার উপায় হলো রাত বারোটার পর পথে বের হওয়া । যদি দেখা যায় সব খাঁখাঁ করছে, তা হলে বুঝতে হবে কোনো আন্দোলন চলছে। পানের দোকানে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ভিড় জমে থাকলেও আন্দোলন হচ্ছে ধরে নেওয়া যায়। বিবিসি-র দিকে গভীর আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে লোকজন কান পেতে থাকে। আমার নিজের ধারণা, কোনো এক এপ্রিল-ফুলের রাতে বিবিসি যদি মজা করে বলে- বাংলাদেশে সরকার-পতন হয়েছে, তা হলে সরকারের পতন হয়ে যাবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী সরকারি বাড়ি ছেড়ে অতি দ্রুত কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে উঠবেন । কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করবে না । বাংলাদেশ টিভি থেকে বলা হবে- বিবিসির খবর অনুযায়ী বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন হয়েছে। বর্তমানে ক্ষমতায় কে আছেন তা তারা বলেননি বলে এই বিষয়ে আমরাও কিছু বলতে পারছি না ।

আমার চারপাশে কেউ ছিল না। একটা কুকুর ছিল, সে পুলিশের গাড়ি দেখে দ্রুত ডাস্টবিনের আড়ালে চলে গেল। যতক্ষণ গাড়ি থেমে রইল ততক্ষণ আর তাকে দেখা গেল না। গাড়ি চলে যাবার পরই সে মাথা বের করে আমাকে দেখল। আমি বললাম, এই আয়”

সে কিছু সন্দেহ, কিছু শঙ্কা নিয়ে বের হয়ে এল। লেজ নড়ছে না- এর অর্থ হচ্ছে আমার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হতে পারছে না । পুলিশের গাড়ি যাকে নামিয়ে দিয়ে যায় তার বাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর পক্ষেও সম্ভব না। কুকুরের সঙ্গে আমি কিছু কথাবার্তা চালালাম ।

'কী রে, তোর খবর কী? রাতের খাওয়া শেষ হয়েছে?'

(কুকুর স্থির চোখে তাকিয়ে আছে। ভবছে।)

'তুই কি এই দিকেরই? রাতে ঘুমাস কোথায়?'

(এখন লেজ একটু নড়ল ।)

'আমি গলির ভেতর ঢুকব। একা ভয়-ভয় লাগছে। তুই আমাকে একটু এগিয়ে দে।'

(লেজ ভালোমতো নড়া শুরু হয়েছে। অর্থাৎ আমাকে সে গ্রহণ করেছে বন্ধু হিসেবে।)

'খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটছিস কেন? তোর পায়ে কী হয়েছে?'

(প্রবল লেজ নাড়ার সঙ্গে এইবার সে কুইকুই করল। অর্থাৎ পায়ে কী সমস্যা সেটা বলল। কুকুরের ভাষা জানা নেই বলে বুঝতে পারলাম না ।)

মনে হয় তার পায়ে কেউ গরম ভাতের মাড় ঢেলে দিয়েছে। গরম মাড় কিংবা গরম পানি কুকুরের গায়ে ফেলে আমরা বড় আনন্দ পাই। ব্যথা-যন্ত্রণায় সে ছটফট করেদেখে আমাদের বড়ই ভালো লাগে। মানুষ হিসেবে সমগ্র পশুজগতে আমরা শ্রেষ্ঠ, সেটা আবারও প্রমাণিত হয় ।

আমার ধারণা, নিম্নশ্রেণীর পশু বলে আমরা যাদের আলাদা করছি, তাদের আলাদা করা ঠিক হচ্ছে না। মানুষ হিসেবে আমরা এমন কিছু এগিয়ে নেই। আমাদের বুদ্ধি বেশি বলে আমরা অহংকার করি- ওদের যে বুদ্ধি কম সেটা কে বলল? আমরা কি কখনো ওদের মাথার ভেতর ঢুকতে পেরেছি যে বলব— ওদের লজিক নেই? আমাদের ভাষা আছে, ওদের নেই।— আরেকটি নিতান্তই হাস্যকর কথা। ওদের ভাষা অবশ্যই আছে। একটা কুকুর

অন্য একটা কুকুরের সাথে নানান বিষয়ে কথাবার্তা বলে। আমরা যখন শুনি তখন মনে হয় শুধুই ঘেউঘেউ করছে। দুজন চাইনিজ কিংবা জাপানিকে যখন কথা বলতে শুনি তখন মনে হয় এরা কিছুই বলছে না, শুধু "চেং বেং'-টাইপ শব্দ করছে। ওদের চেং বেং-এর সঙ্গে ঘেউঘেউ-এর তফাতটা কোথায়?

পশুদের বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে, চিন্তাশক্তি আছে। সব জেনেও এদের আমরা অস্বীকার করি শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থে। অস্বীকার না করলে এদের হত্যা করে আমরা খেতে পারতাম না । আমাদের লজ্জা করত ।

খোঁড়া কুকুরটা আমার আগে আগে যাচ্ছে। মনে হয় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো সে আগেও আমাকে এ-অঞ্চলে আসতে দেখেছে। সে মনে করে রেখেছে। সে জানে আমি কোথায় যাব, তাই আগে আগে নিয়ে যাচ্ছে। নয়তো পেছনে পেছনে আসত। পথে আরও কয়েকটা কুকুর পাওয়া গেল। তারা ঘেউঘেউ করে ওঠার আগেই আমার কুকুরটা ঘেউঘেউ করল । হয়তো বলল, "ঝামেলা করিস না, আমার চেনা লোক" ।

তারাও ঝামেলা করল না। মাথা উচু করে আমাকে দেখে আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আমার কুকুরটা আমার দিকে তাকিয়ে নিচুস্বরে কয়েকবার ঘেউঘেউ করল। এর অর্থ সম্ভবত- "রাতদুপুরে এভাবে হাঁটাহাটি করবে না। দেশের অবস্থা ভালো না । আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। বড় আফসোস! সরকার আর বিরোধীদলে কবে যে মিটমাট হবে!"

আমি কুকুরের পেছনে পেছনে আসগর সাহেব যে গলিতে থাকেন সেই গলিবের করার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা জটিল। শখ নদীর উপশাখা থাকে- সেই উপশাখা থেকেও শাখা বের হয়, যাকে বলা চলে উপ-উপশাখা। আসগর সাহেবের গলিও তেমনি উপ-উপগলি । ঢাকা শহরের সবচে সরু এবং সবচে দীর্ঘ গলি। শুধু যে দীর্ঘ গলি তা না, সবচে দীর্ঘ ডাস্টবিনও । গলির দুপাশের বাসিন্দারা তাদের যাবতীয় আবর্জনা কষ্ট করে দূরে নিয়ে ফেলে না, গলিতেই ঢেলে দেয়। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি তাতে কিছু মনে করে না। কারণ

গলিটার আসলেই কোনো নাম নেই। কোনো একদিন এই গলিতে বিখ্যাত কেউ জন্মাবে, তখন হয়তো নাম হবে। কুখ্যাতদের নামে গলির নাম হলে অবশ্যি এখনই এই গলির নাম রাখা যায়- "কানা কুদ্দুস লেন" । কানা কুদ্দুস কাওরান বাজার এলাকার ত্রাস । মানুষ-খুনকে সে মোটামুটি একটা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তার সঙ্গে আমার মোটামুটি ভাব আছে। দিনের বেলা সে বেঙ্গল মোটর নামে মোটর পার্টসের দোকানে বসে থাকে। সে অতি বিনয়ী, আচার-ব্যবহার বড়ই মধুর। দেখা হলেই সে আমাকে প্রায় জোর করে চা, মোগলাই পরোটা খাওয়ায় ।

গলিটা আমার খুব প্রিয়, কারণ এই গলিতে রিকশা ঢুকতে পারে না। এখানে সবসময়ই হরতাল । শিশুরা প্রায়ই ইটের স্ট্যাম্প বানিয়ে ক্রিকেট খেলে। এখানে এলেই আমি আগ্রহ নিয়ে তাদের খেলা দেখি একবার আমি তাদের আম্পায়ার হিসেবেও কাজ করেছি। পক্ষপাতদুষ্ট আম্পায়ারিং-এ একটা রেকর্ড সেবার করেছিলাম। বোল্ড আউট হয়ে গেছে, ইটের স্ট্যাম্প বলের ধাক্কায় উড়ে চলে গেছে। আমি তাকিয়ে দেখি শিশুব্যাটসম্যান ব্যাট-হাতে কাদোকদো চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে । আমি তখন অবলীলায় কঠিন মুখে বলেছি- নো বল হয়েছে, আউট হয়নি। শিশু-ব্যাটসম্যানের চোখে গভীর আনন্দ । ফিল্ডাররা চ্যাচামেচি করছে। আমি দিয়েছি ধমক— তোমরা বেশি জান? আমি ঢাকা লীগের আম্পায়ার । আমার চোখের সামনে নো বল করে পার হয়ে যাবে, তা হবে না। স্টার্ট দা গেম। নো হাংকিপাংকি ।

এরা আমার হুকুম মেনে নিয়েছে। বয়স্ক একজন মানুষ তাদের খেলার সঙ্গে যোগ দিয়েছে-এতেই তারা আনন্দিত। বয়স্ক মানুষদের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে হয়। শিশুরা জানে বয়স্ক মানুষরা ভুল করে, জেনেশুনে ভুল করে । শিশুরাই শুধু জেনেশুনে কোনো ভুল করে না ।

আসগর সাহেবকে তার বাসায় পাওয়া গেল না। দরজায় মোটা তালা ঝুলছে। এরকম হবার কথা না । আসগর সাহেব রুটিন-বাধা জীবনযাপন করেন । ন'টার আগেই জিপিওতে চলে যান। ফেরেন সন্ধ্যায়। রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়া শেষ করেন। ঘর থেকে বের হন না। গত আঠারো বছরে এই রুটিনের ব্যতিক্রম হয়নি। তার নিজের কোনো সংসার নেই। জীবনের একটা পর্যায়ে হয়তো বিয়ে করে সংসার করার কথা ভেবেছেন। এখন ভাবেন না- ভাবার কথাও না এখন হয়তো মৃত্যুর কথা ভাবেন। একদিন মৃত্যু হবে, যেহেতু সৎ জীবনযাপন করছেন, সেহেতু মৃত্যুর পর বেহেশত-নসিব হবেন। সেখানে সুখের সংসার পাতবেন। এই জীবনে যা করা হয়নি, পরের জীবনে তা করা হবে।

ভদ্রলোক যে অতি সৎভাবে জীবনযাপন করেছেন তা সত্যি। চিঠি লিখে সামান্য যা রোজগার করেছেন- তার সিং দেশে পাঠিয়েছেন। একবেলা খাওয়া অভ্যাস করেছেন। এতে নাকি স্বাস্থ্য ভালো থাকে। স্বাস্থ্য ভালো থাকুক বা না-থাকুক, খরচ অবশ্যই বাঁচে । তিনি খরচ বাঁচিয়েছেন। খরচ বাঁচিয়েছেন বলেই ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনা করাতে পেরেছেন। তারা আজ প্রতিষ্ঠিত ।

এক ভাই সরকারি ডাক্তার। কুড়িগ্রাম সরকারি হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার। অন্য ভাই এক কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। ছোট ভাইরা এখন বড় ভাইয়ের পেশা নিয়ে লজ্জা বোধ করে। তাদের খুব ইচ্ছা বড় ভাই দেশের বাড়িতে গিয়ে স্থায়ী হোন। দেশের বাড়ি ভাইরা মিলে ঠিকঠাক করেছে। পুকুর কাটিয়ে মাছ ছেড়েছে। জমিজমাও কিছু কেনা হয়েছে। আসগর সাহেব নিজেও চান গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকতে। তার বয়স হয়েছে, শরীর নষ্ট হয়েছে- খুবই ক্লান্ত বোধ করেন। বড় ধরনের অসুখবিসুখও হয়েছে হয়তো। ডাক্তার দেখান না বলে অসুখ ধরা পড়েনি। শরীরের এই অবস্থায় গ্রামের বাড়িতে থাকাটা আসগর সাহেবের জন্যে আনন্দের ব্যাপার হবার কথা । ভাইবোনরা তাকে যথেষ্ট পরিমাণ

শ্রদ্ধা করে। এই মানুষটি তাদের বড় করার জন্যে বিয়েটিয়ে কিছু করেনি- সারাজীবন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন, এই সত্য তারা সবসময় স্বীকার করে।

আলি আসগর দেশে যেতে পারছেন না। বিচিত্র এক ঝামেলায় তিনি ফেঁসে গেছেন। ঝামেলাটা হয়েছে সাত বৎসর আগে । দিন-তারিখ মনে নেই, তবে বৃহস্পতিবার ছিল এটা তার মনে আছে। তিনি তার নিজের জায়গায় টুলবক্স নিয়ে বসে আছেন, লুঙ্গি ও ফতুয়া-পরা এক লোক এসে সামনে উবু হয়ে বসল। সে কিছু টাকা মনিঅর্ডার করতে চায়। টাকার পরিমাণ সাত হাজার এক টাকা। লোকটি প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে বলল, অনেক কষ্ট কইরা ট্যাকাগুলান জমাইছি ভাইসাব- পরিবাররে পাঠামু। ট্যাকা কেমনে পাঠায় জানি না। আপনে ব্যবস্থা কইরা দেন। আপনের পায়ে ধরি ।

বলে সত্যি সত্যি সে তার পা চেপে ধরল। আসগর সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, করেন কী, করেন কী!

‘গরিব মানুষ ভাইসাব, ট্যাকাগুলান সম্বল। বড় কষ্ট কইরা জমাইছি, কেমনে পাঠামু জানি না ।’

‘আপনার নাম কী?’

‘মনসুর।’

‘মনসুর, ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। কোনো সমস্যা না। ঠিকমতো নাম-ঠিকানা বলেন। কার নামে পাঠাবেন?’

‘পরিবারের নামে ।’

‘পরিবারের নাম কী?’

‘জহুরা খাতুন।’

‘গ্রাম, পোস্টাপিস সব বলেন...। আচ্ছা দাঁড়ান, মানিওর্ডার ফরম আগে নিয়ে আসি ।’

মনিঅর্ডার ফরম আনতে গিয়ে দেখা গেল বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। সব বন্ধ হয়ে গেছে। শনিবারের আগে মনিঅর্ডার করা যাবে না। আসগর সাহেব বললেন, ভাই, আপনি শনিবার সকাল দশটার মধ্যে চলে আসবেন । আমি মনিঅর্ডার করে দেব। কোনো টাকা লাগবে না। বিনা টাকায় করব । চা খাবেন? চা খান ।

লোকটা চা খেল। তার মনে হয় কিছু সমস্যা আছে। চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ কাঁদল । চলে যাবার সময় সাগর সাহেবকে অবাক করে দিয়ে বলল, ভাইজান, ট্যাকাগুলান সাথে নিয়া যাব না। আমার অসুবিধা আছে। আপনের কাছে থাউক। আমি শনিবারে আসুম।

আসগর সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার কাছে টাকা রেখে যাবেন? এতগুলো টাকা ।

লোকটা আগের মতো অস্পষ্ট গলায় বিড়বিড় করে বলল, জি ভাইজান। কোনো উপায় নাই। গরিবের বহুত কষ্টের ট্যাকা। আপনের হাতে দিয়া গেলাম ভাইজান— আমি শনিবারে আসমু ।

লোকটি আর আসেনি। আসগর সাহেব সাত বৎসর টাকা নিয়ে অপেক্ষা করছেন । লোকটা আসছে না বলে তিনি দায়মুক্ত হয়ে দেশের বাড়িতে যেতে পারছেন না। সম্পূর্ণ অকারণে তিনি অন্যের সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছেন। কিছু কিছু মানুষ থাকে যাদের নিজেদের তেমন কোনো সমস্যা থাকে না। তারা নিজের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন অদ্ভুত সব সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। নিজেকে কিছুতেই অন্যের সমস্যা থেকে মুক্ত করতে পারে না। হাজার চেষ্টা করেও না ।

আসগর সাহেবের ঘর দোতলায় । একতলায় দরজির একটা দোকান- দরজির নাম বদরুল মিয়া । বদরুল মিয়া পরিবার নিয়ে দোতলায় থাকেন। তিনি তার একটি ঘর সাবলেট দিয়েছেন আলি আসগরকে । রাত আড়াইটা বাজে— এই সময়ে বদরুল মিয়াকে ডেকে তুলে আসগর সাহেব সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাস করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না।

বদরুল মিয়া অবিশ্যি এমিতে খুব মাইডিয়ার ধরনের লোক। বয়স পঞ্চাশের উপরে। ছোটখাটো হাসিখুশি মানুষ। মাথায় টুপি পরে হাসিমুখে অনবরত ঘটাং ঘটাং করে পামেশিন চালান। বদরুল মিয়ার বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি মেয়েদের ব্লাউজ ছাড়া অন্যকিছু বানাতে পারেন না। কিংবা পারলেও বানান না। ব্লাউজ মনে হয় তিনি ভালো বানান। তার দোকানে মেয়েদের ভিড় লেগেই থাকে। মেয়েরাও তাকে খুব পছন্দ করে। তাকে বদরুল চাচা না ডেকে 'নূর চাচা' ডাকে। কারণ বদরুল মিয়ার চেহারা দেখতে অনেকটা অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরের মতো।

আমি বদরুল মিয়ার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম–নূর চাচা আছেন নাকি? সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বদরুল মিয়া বের হয়ে এলেন। মনে হয় জেগেই ছিলেন। গভীর রাতে ডেকে তোলার জন্যে তাঁকে মোটেই বিরক্ত মনে হলো না। বরং মনে হলো তিনি আমাকে দেখে গভীর আনন্দ পেয়েছে। মেয়েদের ব্লাউজের কারিগররা হয়তো আনন্দময় ভুবনে বাস করেন। তিনি হাসিমুখে বললেন, ব্যাপার কী হিমু ভাই?

'আসগর সাহেবের খোজে এসেছিলাম। ঘর তালাবদ্ধ। খবর জানেন কিছু?'

'জি না, কিছুই জানি না। আজ দোকান বন্ধ করেছি বারোটার সময়। তখন দেখি আসেন নাই। এরকম কখনো হয় না। উনি সন্ধ্যার সময় চলে আসেন। আমি নিজেও চিন্তাযুক্ত। দেশের অবস্থা ভালো না। আবার দিয়েছে হরতাল!'

বারোটার সময় দোকান বন্ধ করেছেন, আপনার কাজের চাপ মনে হয় খুব বেশি।'

বদরুল মিয়া আনন্দে হেসে ফেলে বললেন, সবই আল্লাহর ইচ্ছা । ব্যবসা মাশাল্লাহ ভালো হচ্ছে। আন্দোলন-টান্দোলনের সময় মেয়েছেলেরা কাপড় বেশি বানায় ।'

'কাপড় না, ব্লাউজ মনে হয় বেশি বানায় ।'

বদরুল মিয়া আবারও মিষ্টি করে হাসলেন। আমি বললাম, আচ্ছা নূর চাচা, আপনার এই অঞ্চলের সব মেয়ের বুকের মাপ আপনি জানেন, তা-ই না?

‘এইটা জানতেই হয়—মাপ লাগে ।’

‘এই অঞ্চলের সবচে বিশালবক্ষা তরুণীর নাম কী?’

বদরুল মিয়া আবার বিনীত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিন্তু বললেন না। গলা-খাকারি দিয়ে হাসি বন্ধ করলেন। আমি বললাম, প্রফেশনাল এথিক্স। নাম বলবেন না। খুব ভাল। নূর চাচা, যাই?

‘আসগর ভাইকে কিছু বলতে হবে?’

‘জি না, কিছু বলতে হবে না।’

‘একটু সাবধানে যাবেন হিমু ভাই। সময় খারাপ—গত রাত তিনটার দিকে একটা মার্ডার হয়েছে। কানা কুদুসের কাজ। মাথা কেটে নিয়ে গেছে। শুধু বডি ফেলে গেছে।’

‘কানা কুদ্দুস আমাকে বোধহয় মার্ডার করবে না। যাই, কেমন? এত রাতে ঘুম ভাঙালাম-কিছু মনে করবেন না।’

‘জি না, এটা কোনো ব্যাপার না। জেগেই ছিলাম, তাহার্জ্জুদের নামাজ পড়ছিলাম। সময় তো ভাই হয়ে এসেছে—আল্লাহপাকের সামনে দাড়াব— কী বলব এই নিয়ে চিন্তাযুক্ত থাকি। তাহার্জ্জুদের নামাজ পড়ে ওনার দরবারে কান্নাকাটি করি।’

গলিতে নেমে দেখি, কুকুরটা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাকে দেখে গম্ভীর ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। সে আমাকে নিয়ে এসেছে, কাজেই নিয়ে যাবার দায়িত্বও বোধ করছে। আমি কুকুরটাকে বললাম, চল যাই । যার খোঁজে এসেছিলাম তাকে পাওয়া গেল না |

সে চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল । আমি হাঁটছি, সে আসছে আমার পেছনে পেছনে— তার সঙ্গে কথা বলতে সমস্যা হচ্ছে । বারবার মাথা ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতে হচ্ছে।

‘আসগর সাহেবের জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছে করি বল তো!’

(কুকুরটা মাথা নাড়ল । আমার হয় তাকেও স্পর্শ করেছে।)

‘আমার কী ধারণা জানিস? আমার ধারণা তিনিও আমার মতো পুলিশের হাতে ধরা খেয়েছেন । জিরো পয়েন্ট জায় গণ্ডগোলের আখড়া। বের হয়েছে আর পুলিশ ধরেছে। নাভির এক ইঞ্চি উপরে রোলারের গুতা খেয়ে পুলিশ-হাজতে হাত-পা এলিয়ে মনে হয় পড়ে আছেন। তোর কী মনে হয়?’

(ঘেউ ঘেউ-উ-উ-উ। কুকুরের ভাষায় এই শব্দের কী মানে কে বলবে!)

‘আমার ইনটুইশান বলছে রমনা থানায় গেলে আসগর সাহেবের খোঁজ পাব। তবে যেতে ভয় লাগছে। প্রথমবার ভাগ্যগুণে ছাড়া পেয়েছি, আবার পাব কি না কে জানে! অন্যের ব্যাপারে আমার ইনটুইশান কাজ করে—নিজের ব্যাপারে কাজ করে না। এই হচ্ছে সমস্যা—বুঝলি?

কুকুরটা আমাকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আমি তার গায়ে হাত দিয়ে আদর করলাম। বললাম, আজ যাই, পরে একদিন তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসব। কাবাব হাউসের ভালো কাবাব। শিককাবাব আর নানরুটি । তুই ভালো থাকিস। খোড়া পা নিয়ে এত হাঁটাহাটি করিস না। পা-টার রেস্ট দরকার ।

আমি রওনা দিয়েছি রমনা থানার দিকে। কুকুরটা মূর্তির মতো দাড়িয়ে আছে। আমাকে যতক্ষণ দেখা যাবে ততক্ষণই সে দাঁড়িয়ে থাকবে । যেতে যেতে মারিয়ার কথা কি ভাবব? অফ করা সুইচ অন করে দেব? একটা ইন্টারেস্টিং চিঠি মেয়েটা লিখেছিল। সাংকেতিক ভাষার চিঠি । কিছুতেই তার অর্থ বের করতে পারি না । দিনের পর দিন কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে বসে থাকি । শেষে এমন হলো অক্ষরগুলি মাথায় গেথে গেল। মস্তিষ্কের নিউরোন একটা স্পেশাল ফাইল খুলে সেই ফাইলে চিঠি জমা করে রাখল। ফাইল খুলে চিঠিটা কি দেখব? দেখা যেতে পারে ।

EFBS IJNV WIBJ.

TPNFULJOH WFSZ TUSBOHF IBT
IBQQFOFE UP NF. J BN JO
MPWF XJUI ZPV. QMFBTF IPME
NF JO ZPVS BSNT.
NBSJB

এই সাংকেতিক চিঠির পাঠোদ্ধার করে আমার ফুপাতো ভাই বাদল। তার সময় লাগে তিন মিনিটের মতো। ঐ প্রসঙ্গে ভাবতে ইচ্ছা করছে না। আমি মাথার সব কটা সুইচ অফ করে দিলাম।

প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। দুপুরে কি কিছু খেয়েছি? না, দুপুরে খাওয়া হয়নি। খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা আমার এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। টাকাপয়সার খুব সমস্যা যাচ্ছে। বড় ফুপা (বাদলের বাবা) আগে প্রতি মাসে হাজার টাকা দিতেন । এই শর্তে দিতেন যে, আমি বাদলের সঙ্গে দেখা করব না। আমার প্রচণ্ড রকম দূষিত সম্মোহনী ক্ষমতা থেকে বাদল রক্ষা পাবে। আমি শর্ত মেনে দূরে দূরে আছি। মাসশেষে ফুপার অফিস থেকে টাকা নিয়ে আসি । গত দুমাস হলো ফুপা টাকা দেয়া বন্ধ করেছেন। শেষবার টাকা আনতে গেলাম, ফুপা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন- মাই ডিয়ার ইয়াংম্যান, তুমি ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছ, কাজটা কি ভালো হচ্ছে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, এই দেশে শতকরা ত্রিশ ভাগ লোক ভিক্ষা করে জীবনযাপন করছে। কাজেই আমি খারাপ কিছু দেখছি না।

‘তোর শরীর ভালো, স্বাস্থ্য ভালো, পড়াশোনা করছিস- তুই যদি ভিক্ষা করে বেড়াস, সেটা দেশের জন্য খারাপ ।’

‘অর্থাৎ আপনি আমাকে মানথলি অ্যালাউন্স দেবেন না?’

ফুপা বিস্মিত হয়ে বললেন, কয়েক মাস তোকে টাকা দিয়েছি ওমি তোর ধারণা হয়ে গেছে টাকাটা তোর প্রাপ্য। এটা তো খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। মাই ডিয়ার ইয়াংম্যান, টাকা কষ্ট করে রোজগার করতে হয়। একজন মাটি-কাটা শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাটি কেটে কত পায় জানিস? মাত্র সত্তর টাকা। তুই কি মাটি কাটছিস?

'জি না ।'

'তা হলে?'

'তা হলে আর কী? চা দিতে বলেন। চা খেয়ে বিদেয় হয়ে যাই ।'

'হ্যা, চা খা । চা খেয়ে বিদেয় হ।'

'বাদলের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না । ও আছে কেমন? ওর সঙ্গে দেখা করতে যাব | তখন গেলে ওকে পাওয়া যায়?'

ফুপা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলেন। আমি তার দুই দফা হাসিতে বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

'হিমু!'

'জি ফুপা?'

'আমার বাড়িতে আসার ব্যাপারে তোর উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা এখন তুলে নেয়া হল- তুই যখন ইচ্ছা আসতে পারিস।'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, বাদল কি দেশে নেই?

ফুপা আবারও তার বিখ্যাত হাসি হেসে বললেন, না। তাকে দেশের বাইরে পড়তে পাঠিয়েছি। তোর হাত থেকে ওকে বাচানোর একটাই পথ ছিল ।

'ভালো করেছেন।'

'ভালো করেছি তো বটেই! এখন চা খা- চা খেয়ে পথে-পথে ঘুরে বেড়া।'

'চায়ের সঙ্গে হালকা স্ন্যাকস কি পাওয়া যাবে ফুপা?'

'নো স্ন্যাকস । চা যে খেতে দিচ্ছি- এটাই কি যথেষ্ট না?'

‘যথেষ্ট তো বটেই!’

আমি ফুপার অফিস থেকে চা খেয়ে চলে আমার বাধা রোজগার বন্ধ । তাতে খুব যে ঘাবড়ে গেছি তা না। বাংলাদেশ ভিক্ষাবৃত্তির দেশ। এই দেশে ভিক্ষাবৃত্তিকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এখানে ভিক্ষা করে বেঁচে থাকা খুব কঠিন হবার কথা না। এখন অবিশ্যি কঠিন বলে মনে হচ্ছে। খিদেয় অস্থির বোধ করছি।

ভোরবেলা হাঁটতে হাঁটতে মারিয়াদের বাড়িতে উপস্থিত হলে তারা সকালের নাশতা অবশ্যই খাওয়াবে। ইংলিশ ব্রেকফাস্ট–প্রথমে আধা গ্লাস কমলার রস। খিদেটাকে চনমনে করার জন্যে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ কমলার রসের কোনো তুলনা নেই। তারপর কী? তারপর অনেক কিছু আছে। সব টেবিলে সাজানো। যা ইচ্ছা তুলে নাও।

১ । পাউরুটির স্লাইস

(পাশেই মাখনের বাটিতে মাখন। মাখন-কাটা ছুরি। মারমালেডের বোতল। অনেকে পাউরুটির স্লাইসে পুরু করে মাখন দিয়ে, তার উপর হালকা মারমালেড ছড়িয়ে দেন।)

২। ডিমসিদ্ধ

(হাপ বয়েলড়। ডিম সিদ্ধের সঙ্গে আছে গোলমরিচের গুড়া ও লবণ। ডিম ভাঙতেই ভেতর থেকে গরম ভাপ উঠবে- হলদে কুসুম গড়িয়ে পড়তে শুরু করবে- তখন তার উপর ছিটিয়ে দিতে হবে গোলমরিচ ও লবণ ।)

৩। গোশত ভাজা

(ইংরেজি নামটা যেন কী? সসেজ? ফ্রায়েড সসেজ? আগুন-গরম সসেজ। খাবার নিয়ম হলো এক টুকরা গোশত ভাজা, এক চুমুক ব্ল্যাক কফি... তাড়াহুড়া কিছু নেই। ফাঁকে-ফাঁকে খবরের কাগজ পড়া যেতে পারে। সব পড়ার দরকার নেই, শুধু হেডলাইন...)

আচ্ছা, এইসব কী? আমি কি পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছি? আমি না একজন মহাপুরুষটাইপ মানুষ? খাদ্যের মতো অতি স্কুল একটা ব্যাপার আমাকে অভিভূত করে রাখবে, তা কী করে হয়?

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০৪

হিরোস ওয়েলকাম' বলে একটি বাক্য আছে। মহান বীর যুদ্ধজয়ের পর দেশে ফিরলে যা হয়— আনন্দ-উল্লাস, আতশবাজি পোড়ানো, গণসংগীত। থানায় পা দেয়া মাত্র হিরোস ওয়েলকাম বাক্যটি আমার মাথায় এল। আমাকে নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেল। সেন্ট্রির সেপাই একটা বিকট চিৎকার দিল- "আরে হিমু ভাইয়া!" আমি গেলাম হকচকিয়ে। থানার সবাই ছুটে এলেন। সেকেন্ড অফিসার একগাল হেসে বললেন, "স্যার, কেমন আছেন?' ওসি সাহেব আমাকে হাত ধরে বসাতে বসাতে বললেন, ভাইসাহেব, আরাম করে বসুন তো! আপনি আমাদের যা দুশ্চিন্তায় ফেলেছিলেন। কাওরান বাজারে যেখানে আপনাকে নামিয়ে দিয়েছে সেখানে দুবার জিপ পাঠিয়েছি আপনার খোঁজে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, ব্যাপার কী?

'ব্যাপারটা যে কী সে তো আপনি বলবেন! আপনি যে এরকম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তা তো বুঝিনি। মানুষের কপালে তো লেখা থাকে না সে কে। লেখা থাকলে পুলিশের জন্যে ভালো হতো– কপালের লেখা দেখে হাজতে ঢুকাতাম, লেখা দেখে চা-কফি খাইয়ে স্যালুট করে বাসায় পৌছে দিতাম।'

'ভাই, আমি অতি নগণ্য হিমু।'

'আপনি নগণ্য হলে আমাদের এই অবস্থা!'

'কী অবস্থা?'

'একেবারে বেড়াছেড়া অবস্থা। দাঁড়ান সব বলছি। ভাই সাহেব, চা খান— ঐ আকবর, হিমু ভাইয়ারে চা দে। তারপর ভাইসাহেব শোনেন কী ব্যাপার। আপনাকে তো ছেড়ে দিলাম, তার পরই মারিয়া নামের একটি মেয়ে টেলিফোন করল- আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়

। আমি যতই বলি ছেড়ে দিয়েছি ততই চেপে ধরে । আমার কথা বিশ্বাস করে না, রাগ করে টেলিফোন রেখে দিলাম, তারপর শুরু হলো গজব ।

'কী গজব?'

'একের পর এক টেলিফোন আসা শুরু হলো, ডিআইজি, এআইজি, সবশেষে আইজি সাহেব নিজে। আমি স্যারদের বললাম- আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা বিশ্বাস করলেন । তারপর টেলিফোন করলেন হোম মিনিস্টার । রাত তখন তিনটা দশ । মন্ত্রীরা তো সহজে কিছু বোঝেন না। যতই বলি, স্যার, ওনাকে ছেড়ে দিয়েছি— মন্ত্রী বলেন, দেখি লাইনে দিন, কথা বলি। আরে, যাকে ছেড়ে দিয়েছি তাকে লাইনে দেব কীভাবে? আমি কি জাদুকর জুয়েল আইচ?

উনি বললেন, হিমু সাহেবকে যেখান থেকে পারেন খুঁজে আনেন ।

'আমার কলজে গেল শুকিয়ে । হাটে ড্রপ বিট শুরু হলো । এখন আপনাকে দেখে কলিজায় পানি এসেছে। হার্টও নরমাল হয়েছে। ভাইয়া, আপনি যে এমন তালেবর ব্যক্তি সেটা বুঝতে পারিনি। নিজগুণে ক্ষমা করে দিন। পায়ের ধুলাও কিছু দিয়ে দেবেন, বোতলে ভরে থানার ফাইল ক্যাবিনেটে রেখে দেব। এখন হিমু ভাইয়া, আপনি টেলিফোনটা হাতে নিন। যাদের নাম বললাম এক এক করে তাদের সবাইকে টেলিফোন করে জানান যে আপনি আছেন। আপনার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়ে ওঁদের শান্ত করুন। ওনারা বড়ই অশান্ত ।'

'এঁদের কাউকেই আমি চিনি না ।'

'আপনি এঁদের চেনেন না, আর এঁরা আমার জান পানি করে দেবে, তা তো হবে না ভাইয়া! নাচতে নেমেছেন, এখন আর ঘোমটা দিতে পারবেন না। আপনি মারিয়াকে টেলিফোন করুন তার থেকে নাম্বার নিয়ে অন্যদের টেলিফোনে ধরুন |'

আকবর চা নিয়ে এসেছে। ওসি সাহেব আকবরের কাছ থেকে চায়ের কাপ নিয়ে আমার সামনে রাখলেন। আকবরের দিকে আগুন-চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হারামজাদা, এক কাপ

চা আনতে এতক্ষণ লাগে?' বলেই আচমকা এক চড় বসালেন। আকবর উলটে পড়ে গেল। আবার স্বাভাবিকভাবে উঠে দাড়িয়ে চলে গেল, যেন কিছুই হয়নি।

ওসি সাহেব টেলিফোন সেট আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাম্বার বলুন, আমি ডায়াল করে দিচ্ছি। ডায়াল করতে আপনার কষ্ট হবে। আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না ।

'নাম্বার হচ্ছে আট-আমি-তুমি-আমি-তুমি- এর মানে ৮ ১২ ১২৩।'

ভাই, আপনার কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারছি না। বুঝতে চাচ্ছিও না। আপনি নিজেই টেলিফোন করুন। বুঝলেন হিমু ভাইয়া, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যতদিন পুলিশে চাকরি করব ততদিন হলুদ পাঞ্জাবি পরা কাউকে ধরব না। মার্ডার কেইসের আসামি হলেও না।'

মারিয়া জেগেই ছিল। আমি তাক জানালাম যে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। আমি ছাড়া পেয়েছি এবং ভালো আছি।

মারিয়া বলল, আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি কে বলল? আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছি না। অকারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মেয়ে আমি না। বাবা দুশ্চিন্তা করছেন। আমার কাছ থেকে আপনার গ্রেফতারের কথা শুনে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। তারপর শুরু করলেন টেলিফোন ।

'আসাদুল্লাহ সাহেব কেমন আছেন?'

'ভালো আছেন। টেলিফোন রাখি?'

'তুই রেগে আছিস কেন?'

'আপনাকে অসংখ্যবার বলেছি- তুই-তুই করবেন না।'

'আচ্ছা, করব না। তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে আছ কেন?'

'হিমু ভাই, আপনি অকারণে কথা বলছেন।'

'তোমার বাবা কি জেগে আছেন?'

'হ্যা, জেগে আছেন। বাবা রাতে ঘুমুতে পারেন না। আপনি কি বাবার সঙ্গে কথা বলবেন?'

'না।'

'বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে এত ব্যস্ত, আপনি তার সঙ্গে সামান্য কথা বলতেও আগ্রহী না?'

'মরিয়ম, ব্যাপারটা হলো কী...'

'মরিয়ম বলছেন কেন? আমার নাম কি মরিয়ম...?'

'ভুল হয়ে গেছে।'

'ভুল তো হয়েছেই। আপনি একের পর এক ভুল করবেন— তারপর সেই ভুলটা শুদ্ধ হিসেবে দেখাবার একবার চেষ্টা করবেন। সেটা কি ঠিক?'

'কী ভুল করলাম?"

'যখন আপনাকে আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হয়েছিল তখন আপনি ঠিক করলেন- আমাদের বাসায় আর আসবেন না । বাবা আপনাকে এত পছন্দ করেন— তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, আপনার কথা বলেন- কিন্তু আপনার খোঁজ নেই। যাতে আমরা আপনার খোঁজ না পাই তার জন্যে আগের ঠিকানা পর্যন্ত পালটে ফেললেন।'

'মারিয়া, তোমাদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঠিকানা পালটাইনি। আমার অভ্যাস হচ্ছে দুদিন পরপর জায়গা-বদল করা। মানুষ গাছের মতো, এক জায়গায় কিছুদিন থাকলেই শিকড় গজিয়ে যায়। আমি চাই না আমার শিকড় গজাক ।'

'হিমু ভাই, হাত জোড় করে আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, দয়া করে আমার সঙ্গে ফিলসফি করার চেষ্টা করবেন না। আপনি আমাদের বাসায় আসা বন্ধ করেছিলেন, কারণ আমি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল কম। পনেরো বছর। পনেরো বছরের একটি কিশোরী তো ভুল করবেই। মেয়েরা তাদের জীবনের সবচে বড় ভুলগুলি অ্যাডোলেসেন্স প্রিরিয়ডে করে, আমিও করেছি।'

'ভুল বলছ কেন? তখন যা করেছিলে হয়তো ঠিকই করেছিলে । এখন ভুল মনে হচ্ছে। আমি জানতাম একদিন তোমার এরকম মনে হবে...'

'জানতেন বলেই আমার চিঠির জবাব দেননি?'

'মারিয়া, তোমাকে বলেছি- চিঠির পাঠোদ্ধার আমি করতে পরিনি।'

'আবার মিথ্যা বলছেন?'

'পুরোপুরি মিথ্যা না। পঞ্চাশ ভাগ মিথ্যা। আমি আবার একশো ভাগ মিথ্যা বলতে পারি না । সবসময় মিথ্যার সঙ্গে সত্যি মিশিয়ে দি ।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, মিথ্যা কতটুকু আর সত্যি কতটুকু?'

'আমি পাঠোদ্ধার করতে পারিনি এটা সত্যি, তবে বাদল পেরেছে।'

'বাদল কে?'

'আমার ফুপাতো ভাই। আমার মহাভক্ত। আমার শিষ্য বলা যেতে পারে।'

'আপনি আমার চিঠি দুনিয়ার সবাইকে দেখিয়ে বেড়িয়েছেন?'

'সবাই না, শুধু বাদলকে দিয়েছিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বের করে ফেলল— তখন আর চিঠিটা পড়তে আমার ইচ্ছা করল না। কাজেই অর্থ বের করার পরেও আমি চিঠি পড়িনি।'

'আপনি চিঠি পড়েননি?'

'না।'

'কী লিখেছিলাম জানতে আগ্রহ হয়নি?'

'আগ্রহ চাপা দিয়েছি।'

'কারণ হলো.. '

'থাক, কারণ শুনতে চাই না।'

মারিয়া হঠাৎ করে বলল, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি টেলিফোন রাখলাম। ভালো কথা, আপনার ঠিকানা বলুন, লিখে নিই। আর শুনুন, মা আপনাকে হাত দেখাতে চান। একদিন এসে মা'র হাতটা দেখে দিন ।

আমি ঠিকানা বললাম। সে টেলিফোন রাখল। আমি ওসি সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তিনি হাসলেন না। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম, আপনার দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। ভালো কথা, আপনাদের হাজতে আলি আসগর বলে কি কেউ আছে? বেচারার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ।

ওসি সাহেব সেকেন্ড অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু ভাইয়াকে হাজতে নিয়ে যান। উনি নিজে দেখুন। আসগর-ফাসগর যাকেই পান নিয়ে বাড়ি চলে যান।

আসগর সাহেব হাজতে ছিলেন। মনে হলো নাভির এক ইঞ্চি উপরে রোলারের গুঁতা খেয়েছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। আমি তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে এলাম ।

পুলিশের জিপ থাকলে এবারও হয়তো জিপে করে আমাদের পৌঁছাত। জিপ ছিল না। সকাল হয়ে আসছে। পিকেটাররা বের হবে। আগামীদিনের হরতাল জম্পেশ করে করা হবে। পুলিশের ব্যস্ততা সীমাহীন।

আমরা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। আসগর সাহেব হাঁটতে পারছেন না। আমি বললাম, রোলারের গুঁতা খেয়েছেন? আসগর সাহেব কিছু বললেন না। বলবেন না, তাও জানি । কিছু মানুষ আছে অন্যের সমস্যায় জড়িয়ে যায়, কিন্তু নিজের সমস্যা আড়াল করে রাখে ।

'হিমু ভাই!'

'জি?'

'একটু বসব।'

'শরীর খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

আমি তাঁকে সাবধানে ফুটপাতের উপর বসালাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বমি করলেন। রক্তবমি ।

'আসগর সাহেব!'

'জি!'

'আপনার অবস্থা তো মনে হয় সুবিধার না।'

'জি ।'

'চলুন আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। বাসায় গিয়ে লাভ নেই।'

'নেবেন কীভাবে? উঠে দাড়াতে পারছি না।'

'একটা-কিছু ব্যবস্থা হবেই। ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আসুন বসে থাকি। নাকি শোবেন?'

'জি আচ্ছা।'

আমি তাকে ফুটপাতে শুইয়ে দিলাম। মাথার নিচে ইটজাতীয় কিছু দিতে পারলে ভালো হতো । ইট দেখছি না ।

'হিমু ভাই।'

'জি?'

'রাজনীতিবিদরা সাধারণ মানুষদের কষ্ট দিতে এতো ভালোবাসে কী জন্যে? তারা রজনীতি করেন— আমরা কষ্ট পাই । এর কারণ কী?'

'রাজনীতি হলো রাজাদের ব্যাপার—বোধহয় এজন্যেই । রাজনীতি বাদ দিয়ে তাঁরা যখন জননীতি করবেন তখন আর আমাদের কষ্ট হবে না ।'

'এরকম কি কখনো হবে?'

'বুঝতে পারছি না। হবার তো কথা। মেঘের আড়ালে সূর্য থাকে।'

'সূর্য কি আছে?

'সূর্য নিশ্চয়ই আছে। মেঘ সরে গেলেই দেখা যাবে,'

'মেঘ যদি অনেক বেশি সময় থাকে তাহলে কিন্তু একসময় সুর্য ডুবে যায়। তখন মেঘ কেটে গেলেও সূর্যকে আর পাওয়া যায় না।'

আমি শঙ্কিত বোধ করছি। ভয়াবহ ধরনের অসুস্থ মানুষেরা হঠাৎ দার্শনিক হয়ে ওঠে। ব্রেইনে অক্সিজেনের অভাব হয়। অক্সিজেন ডিপ্রাইভেশনঘটিত সমস্যা দেখা দিতে থাকে। উচ্চস্তরের ফিলসফি আসলে মস্তিষ্কে অক্সিজেন ঘাটতিজনিত সমস্যা। আসগর সাহেবকে দ্রুত হাসপাতাল নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। রিকশা, ভ্যানগাড়ি কিছুই দেখছি না।

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হলো। মাটি-কাটা কুলি একজন পাওয়া গেল। সে কাঁধে করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। বিনিময়ে তাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে।

আসগর সাহেব মানুষের কাঁধে চড়তে লজ্জা পাচ্ছেন। আমি বললাম, লজ্জার কিছু নেই। হাসিমুখে কাঁধে চেপে বসুন। চিরকালই মানুষ মানুষের কাঁধে চেপেছে। একটা ঘোড়া আরেকটা ঘোড়াকে কাঁধে নিয়ে চলে না- মানুষ চলে। সৃষ্টির সেরা জীবদের কাণ্ডকারখানাও সেরা ।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০৫

গল্প-উপন্যাসে "পাখি-ডাকা ভোর" বাক্যটা প্রায়ই পাওয়া যায় । যারা ভোরবেলা পাখির ডাক শোনেন না তাদের কাছে 'পাখি-ডাকা ভোরের" রোমান্টিক আবেদন আছে। লেখকরা কিন্তু পাঠকদের বিভ্রান্ত করেন- তারা পাখি-ডাকা ভোর বাক্যটায় পাখির নাম বলেন না। ভোরবেলা যে-পাখি ডাকে তার নাম কাক । 'কাক-ডাকা ভোর' লিখলে ভোরবেলার দৃশ্যটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যেত।

কাকের কা-কা শব্দে আমার ঘুম ভাঙল। খুব একটা খারাপ লাগল তা না। কা-কা শব্দ যত কর্কশই হোক, শব্দটা আসছে পাখির গলা থেকেই। প্রকৃতি অসুন্দর কিছু সৃষ্টি করে না—কাকের মধ্যেও সুন্দর কিছু নিশ্চয়ই আছে। সেই সুন্দরটা বের করতে হবেএই ভাবতে ভাবতে বিছানা থেকে নামলাম। তার পরই মনে হলো—এত ভোরে বিছানা থেকে শুধু শুধু কেন নামছি? আমার সামনে কোনো পরীক্ষা নেই যে হাতমুখ ধুয়ে বই নিয়ে বসতে হবে। ভোরে ট্রেন ধরার জন্যে স্টেশনে ছুটতে হবে না। চলছে অসহযোগের ছুটি । শুধু একবার ঢাকা মেডিকেলে যেতে হবে। আসগর সাহেবের খোজ নিতে হবে। খোজ না নিলেও চলবে। আমার তো কিছু করার নেই। আমি কোনো চিকিৎসক না। আমি অতি সাধারণ হিমু। কাজেই আরও খানিকক্ষণ শুয়ে থাকা যায়। চৈত্রমাসের শুরুর ভোরবেলাগুলিতে হিম-হিম ভাব থাকে। হাত-পা গুটিয়ে পাতলা চাদরে শরীর ঢেকে রাখলে মন্দ লাগে না |

অনেকে ভোর হওয়া দেখার জন্যে রাত কাটার আগেই জেগে ওঠেন। তাদের ধারণা, রাত কেটে ভোর হওয়া একটা অসাধারণ দৃশ্য। সেই দৃশ্য না দেখলে মানবজন্ম বৃথা। তাদের সঙ্গে আমার মত মেলে না। আমার কাছে মনে হয় সব দৃশ্যই অসাধারণ। এই যে পাতলা একটা কথা-গায়ে মাথা ঢেকে শুয়ে আছি এই দৃশ্যেরই কি তুলনা আছে? কাঁথার ছেড়া ফুটো দিয়ে আলো আসছে। একটা মশাও সেই ফুটো দিয়েই ভেতরে ঢুকেছে। বেচার

খনিকটা হকচকিয়ে গিয়েছে- কী করবে বুঝতে পারছে না। সূর্য উঠে যাবার পর মশাদের রক্ত খাবার নিয়ম নেই। সূর্য উঠে গেছে। বেচারার বুকে রক্তের তৃষ্ণা। চোখের সামনে খালি গায়ের এক লোক শুয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই তার গায়ের রক্ত খাওয়া যায়—কিন্তু দিনের হয়ে হিমু নামক মানুষটার কানের কাছে ভনভন করছে। মনে হচ্ছে অনুমতি প্রার্থনা করছে। মশাদের ভাষায় বলছে—স্যার, আপনার শরীর থেকে এক ফোটার পাঁচ ভাগের এক ভাগ রক্ত কি খেতে পারি? আপনারা মুমূর্ষ রোগীর জন্যে রক্ত দান করেন, ওদের প্রাণরক্ষা করেন। আমাদের প্রাণও তো প্রাণ—মুদ্র হলেও প্রাণ। সেই প্রাণরক্ষা করতে সামান্য রক্ত দিতে আপনাদের এত আপত্তি কেন স্যার? কবি বলেছেন—"যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে ।"

এইসব দৃশ্যও কি অসাধারণ না? তার পরেও আমরা আলাদা করে কিছু মুহূর্ত চিহ্নিত করি। এদের নাম দিই অসাধারণ মুহূর্ত। সাংবাদিকরা বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রশ্ন করেন—আপনার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা কী? বিখ্যাত ব্যক্তিরা আবার ইনিয়ে বিনিয়ে স্মরণীয় ঘটনার কথা বলেন (বেশিরভাগই বানোয়াট)।

সমগ্র জীবনটাই কি স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে পড়ে না? এই যে মশাটা কানের কাছে ভনভন করতে করতে উড়ছে, আবহ সংগীত হিসেবে ভেসে আসছে কাকদের কা-কা— এই ঘটনাও কি স্মরণীয় না? আমি হাই তুলতে তুলতে মশাটাকে বললাম, খা ব্যাটা, রক্ত খা! আমি কিছু বলব না। ভরপেট রক্ত খেয়ে ঘুমুতে যা—আমাকেও ঘুমুতে দে।

মশার সঙ্গে কথোপকথন শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কড়া নড়ল। সূর্য-ওঠা সকালে কে আসবে আমার কাছে? মশাটার কথা বলা এবং বোঝার ক্ষমতা থাকলে বলতাম—যা ব্যাটা, দেখে আয় কে এসেছে। দেখে এসে আমাকে কানেকানে বলে যা । যেহেতু মশাদের সেই ক্ষমতা নেই সেহেতু আমাকে উঠতে হলো। দরজা খুলতে হলো । দরজা ধরে যে দাড়িয়ে আছে তার নাম মারিয়া। এই ভোরবেলায় কালো সানগ্লাসে তার চোখ ঢাকা ।

ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক । চকলেট রঙের সিল্কের শাড়িতে কালো রঙের ফুল ফুটে আছে। কানে পাথর-বসানো দুল, খুব সম্ভব চুনি। লাল রঙ ঝিকমিক করে জ্বলছে। এরকম রূপবতী একজন তরুণীর সামনে আমি ছেড়া কাথা গায়ে দিয়ে দাড়িয়ে আছি। যে-কোনো সময় কাঁথা গা থেকে পিছলে নেমে আসবে বলে এক হাতে কাথা সামলাতে হচ্ছে, অন্য হাতে লুঙ্গি। তাড়াহুড়া করে বিছানা থেকে নেমেছি বলে লুঙ্গির গিট ভালোমতো দেয়া হয়নি। লুঙ্গি খুলে নিচে নেমে এলে ভয়াবহ ব্যাপার হবে—আধুনিক ছোটগল্প। গল্পের শিরোনাম—নাঙ্গুবাবা ও রূপবতী মারিয়া ।

আমি নিজেকে সামলাতে সামলাতে বললাম, মরিয়ম, তোমার খবর কী? ভোরবেলায় চোখে সানগ্লাস! চোখ উঠেছে?

'না, চোখ ওঠেনি। আপনার খবর কী?'

'খবর ভালো। এত সকালে এলে কীভাবে? হেঁটে?'

'যতটা সকাল আপনি ভাবছেন এখন তত সকাল না। সাড়ে দশটা বাজে।'

'বল কী।'

'হ্যাঁ।'

'এসেছ কী করে, গাড়ি-টাড়ি তো চলছে না!'

'রিকশায় এসেছি।'

'গুড |'

'ভিখিরিদের এই কাথা কোথায় পেয়েছেন?'

'আমার স্থাবর সম্পত্তি বলতে এই কাথা, বিছানা এবং মশারি।'

'কাঁথা জড়িয়ে আছেন কেন?'

'খালি গা তো, এই জন্যে কথা জড়িয়ে আছি ।'

'আপনার কাছে কেন এসেছি জানেন?"

'না।'

'আপনাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলার জন্যে এসেছি।'

'বলে ফ্যালো ।'

'পরশু রাতে যখন টেলিফোনে কথা হলো তখনই আমার বলা উচিত ছিল । বলতে পারিনি। বলতে না পারার যন্ত্রণায় সারারাত আমার ঘুম হয়নি। এখন বলব। বলে চলে যাব |'

'চা খাবে? চা খাওয়াতে পারি।'

'এরকম নোংরা জায়গায় বসে আমি চা খাব না ।'

'জায়গাটা আমি বদলে ফেলতে পারি।'

'কীভাবে বদলাবেন?'

'চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চিন্তা করতে হবে—তুই বসে আছিস ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে । শান্ত একটা নদী । তুই যে-জায়গায় বসে আছিস সে-জায়গাটা হচ্ছে বটগাছের একটা গুড়ি। নদীর ঠিক উপরে বটগাছ হয় না—তবু ধরা যাক, হয়েছে। গাছে পাখি ডাকছে।'

'মারিয়া শীতল গলায় বলল, তুই-তুই করছেন কেন?

'মনের ভুলে তুই-তুই করছি। আর হবে না। তোর সঙ্গে আমার যখন পরিচয় তখন তুই-তুই করতাম তো- তাই।'

'আপনি কখনোই আমার সঙ্গে তুই-তুই করেননি। আপনার সঙ্গে আমার কখনো তেমন করে কথাও হয়নি। আপনি কথা বলতেন মা'র সঙ্গে, বাবার সঙ্গে। আমি শুনতাম।'

'ও আচ্ছা ?'

'ও আচ্ছা বলবেন না। আমার স্মৃতিশক্তি খুব ভালো।'

'স্মৃতিশক্তি খুব ভালো তা বলা কি ঠিক হচ্ছে? যা বলতে এসেছিস তা বলতে ভুলে গেছিস ।'

'ভুলিনি, চলে যাবার আগমুহূর্তে বলব।'

'তা হলে ধরে নিতে পারি তুই কিছুক্ষণ আছিস?'

'হ্যাঁ।'

'আমি তা হলে হাতমুখ ধুয়ে আসি আর চট করে চা নিয়ে আসি। দুজনে বেশ মজা করে ময়ূরাক্ষীর তীরে বসে চা খাওয়া হবে।'

'যান, চা নিয়ে আসুন।'

'দু-মিনিটের জন্যে তুই কি চোখ বন্ধ করবি?'

'কেন?'

'আমি কাঁথাটা ফেলে দিয়ে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিতাম।'

'আপনার সেই বিখ্যাত হলুদ পাঞ্জাবি?'

'হ্যাঁ।'

'চোখ বন্ধ করতে হবে না। রাস্তাঘাটে প্রচুর খালিগায়ের লোক আমি দেখি। এতে কিছু যায়-আসে না। ভালো কথা, আপনি কি তুই-তুই চালিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

আমি পাঞ্জাবি গায়ে দিলাম, লুঙ্গি বদলে পায়জামা পরলাম। আমার তোষকের নিচে কুড়ি টাকার একটা নোট থাকার কথা। বদুর চায়ের দোকানে আগে বাকি দিত- এখন দিচ্ছে না। চা আনতে হলে নগদ পয়সা লাগবে । আমরা সম্ভবত অতি দ্রুত ফ্যালো কড়ি মাখো তেলের জগতে প্রবেশ করছি। কিছুদিন আগেও বেশিরভাগ দোকানে বাধানো ফ্রেমে লেখা থাকত— "বাকি চাহিয়া লজ্জা দিবেন না" । সেইসব দোকানে বাকি চাওয়া হতো। দোকানের মালিকরা লজ্জা পেতেন না। এখন সেই লেখাও নেই, বাকির সিস্টেমও নেই। তোষকের নিচে কিছু পাওয়া গেল না। বদুর কাছ থেকে চা আসার ব্যাপারটা অনিশ্চিত হয়ে গেল ।

মরিয়ম খাটের কাছে গেল। খাটে বসার ইচ্ছা বোধহয় ছিল । খাটের নোংরা চাদর, তেল-চিটচিটে বালিশ মনে হচ্ছে পছন্দ হয়নি। চলে গেল ঘরের কোণে রাখা টেবিলে । সে বসল টেবিলে পা ঝুলিয়ে। আমি শঙ্কিত বোধ করলাম। টেবিলটা নড়বড়ে—তিনটা মাত্র পা। চার নম্বর পায়ের অভাবমোচনের চেষ্টা করা হয়েছে টেবিলটাকে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে । মরিয়ম টেবিলে বসে যেভাবে নড়াচড়া করছে তাতে ব্যালেন্স গণ্ডগোল করে যে-কোনো মুহূর্তে কিছু-একটা ঘটে যেতে পারে। মরিয়ম পা দোলাতে দোলাতে বলল, আপনার এই ঘর কখনো বাট দেয়া হয় না।

'একেবারেই যে হয় না তা না । মাঝে মাঝে হয়।'

'তোষকের নিচে কী খুঁজছেন?'

'টাকা। পাচ্ছি না। হাপিস হয়ে গেছে। তুই কি দশটা টাকা ধার দিবি?'

'না। আমি ধার দিই না। আপনার বিছানার উপর যে-জিনিসটা ঝুলছে তার নাম কি মশারি?'

'হুঁ।'

'সারা মশারি জুড়েই তো বিশাল ফুটা—কী কাণ্ড!'

'তুই আমার মশারি দেখে রাগ করছিস–মশারা খুব আনন্দিত হয়। মশারি যখন খাটাই মশারা হেসে ফেলে।'

'মশাদের হাসি আপনি দেখেছেন?'

'না দেখলেও অনুমান করতে পারি। তুই কি চোখ থেকে কালে চশমাটা নামাবি? অসহ্য লাগছে।'

'অসহ্য লাগছে কেন?'

'আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন আমাদের একজন টিচার ছিলেন- সরোয়ার স্যার। ইংরেজি পড়াতেন। খুব ভালো পড়াতেন। হঠাৎ একদিন শুনি স্যার অন্ধ হয়ে গেছেন। মাস দুএক

পর স্যার স্কুলে এলেন। তার চোখে কালো সানগ্লাস। অন্ধ হবার পরও স্যার পড়াতেন। দপ্তরি হাত ধরে ধরে তাকে ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিত। চেয়ারে বসে বসে তিনি পড়াতেন। চোখে থাকত সানগ্লাস। স্যারকে মনে হতো পাথরের মূর্তি। এর পর থেকে সানগ্রাস পরা কাউকে দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

মরিয়ম সানগ্লাস খুলে ফেলল। আমি বললাম, তোর চোখ অসম্ভব সুন্দর। কালো চশমায় এরকম সুন্দর চোখ ঢেকে রাখা খুব অন্যায়। আর কখনো চোখে সানগ্লাস দিবি না।

'আমি রোদ সহ্য করতে পারি না। চোখ জ্বালা করে।'

'জ্বালা করলে করুক। তোর চোখ থাকবে খোলা, সুন্দর চোখ সবাই দেখবে। সৌন্দর্য সবার জন্যে ।'

মরিয়ম তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার বুকও খুব সুন্দর। তাই বলে সবাইকে বুক দেখিয়ে বেড়াব?'

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম । মেয়েটা বলে কী! এই সময়ের মেয়েরা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যত সহজে যত অবলীলায় মরিয়ম এই কথাগুলি বলল, আজ থেকে দশ বছর আগে কি কোনো তরুণী এজাতীয় কথা বলতে পারত?

মরিয়ম বলল, হিমু ভাই, আপনি মনে হচ্ছে আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেছেন?

'কিছুটা ঘাবড়ে গেছি তো বটেই!'

'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি এরচে অনেক ভয়ংকর কথা বলি। আপনি দাঁড়িয়ে থেকে সময় নষ্ট করবেন না ।'

'তুই এমন ভয়ংকর ভঙ্গিতে পা দোলাবি না। টেবিলের অবস্থা সুবিধার না।'

আমি বাথরুমের দিকে রওনা হলাম। আমাদের এই নিউ আইডিয়াল মেসে মোট আঠারো জন বোর্ডার- একটাই বাথরুম । সকালের দিকে বাথরুম খালি পাওয়া ঈদের আগে

আন্তনগর ট্রেনের টিকেট পাওয়ার মতো। খালি পেলেও সমস্যা- ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পরপরই দরজায় টোকা পড়বে— 'ব্রাদার, একটু কুইক করবেন।'

আজ বাথরুম খালি ছিল । হাতমুখ ধোয়া হলো, দাঁড়ি শেভ করা হলো না, দাঁত মাজা হলো না । রেজার এবং ব্রাশ ঘর থেকে নিয়ে বের হওয়া হয়নি। পকেটে চিরুনি থাকলে ভাল হতো। মাথায় চিরুনি বুলিয়ে ভদ্রস্থ হওয়া যেত। বেঁটে মানুষরা লম্বা কাউকে দেখলে বুক টান করে লম্বা হবার চেষ্টা করে। ফিটফাট পোশাকের কাউকে দেখলে নিজেও একটু ফিটফাট হতে চায়—ব্যাপারটা এরকম |

মরিয়মের জরুরি কথা জানা গেল–সে এসেছে আমাকে হাত দেখাতে । হাত দেখার আমি কিছুই জানি না। যাঁরা দেখেন তাঁরাও জানেন না। মানুষের ভবিষ্যৎ বলার জন্যে হাত দেখা জানা জরুরি নয়। মন-খুশি-করা জাতীয় কিছু কথা গুছিয়ে বলতে পারলেই হলো। সব ভালো ভালো কথা বলতে হবে। দুএকটা রেখা নিয়ে এমন ভাব করতে হবে যে, রেখার অর্থ ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। অন্তত একবার ভালো কোনো চিহ্ন দেখে লাফিয়ে উঠতে হবে। বিক্ষিত গলায় বলতে হবে- কী আশ্চর্য, হাতে দেখি ত্রিশূল চিহ্ন। এক লক্ষ হাত দেখলে একটা এমন চিহ্ন পাওয়া যায়।

মানুষ সহজে প্রতারিত হয় এরকম কথাগুলির একটি হচ্ছে—"আপনি বড়ই অভিমানী, নিজের কষ্ট প্রকাশ করেন না, লুকিয়ে রাখেন।"

যে সামান্য মাথাব্যথাতে অস্থির হয়ে বাড়ির সবাইকে জ্বালাতন করে সেও এই কথায় আবেগে অভিভূত হয়ে বলবে—ঠিক ধরেছেন। আমার মনের তীব্র কষ্টও আমার অতি নিকটজন জানে না! ভাই, আপনি হাত তো অসাধারণ দেখেন!

আমি মরিয়মের হাত ধরে ঝিম মেরে বসে আছি । এরকম ভাব দেখাচ্ছি যেন গভীর সমুদ্রে পড়েছি—হাতের রেখার কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না। মরিয়ম বিরক্তির সঙ্গে বলল, কী হয়েছে?

আমি বললাম, হাত দেখা তো কোনো সহজ বিদ্যা না । অতি জটিল । চিন্তাভাবনার সময়টা দিতে হবে না?

মরিয়ম বলল, আমার হেডলাইন মাউন্ট অভ লুনার দিকে বেঁকে গেছে। যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা ক্রস। এর মানে কী?

আমি বললাম—এর মানে অসাধারণ ।

মরিয়ম তীক্ষ্ণ গলায় বলল, অসাধারণ?

'অবশ্যই অসাধারণ। তোর মাথা খুব পরিষ্কার। চন্দ্রের শুভ প্রভাবে তুই প্রভাবিত। চন্দ্র তোকে আগলে রাখছে পাখির মতো। মুরগি যেমন তার বাচ্চাকে আগলে রাখে, চন্দ্র তোকে অবিকল সেভাবে আগলে রাখছে। ক্রস যেটা আছে—সেটা আরও শুভ একটা ব্যাপার। ক্রস হচ্ছে—তারকা । তারকাচিহ্নের কারণে সর্ববিষয়ে সাফল্য ।'

মরিয়ম তার হাত টেনে নিয়ে মুখ কালো করে বলল, আপনি তো হাত দেখার কিছুই জানেন না। হেডলাইন যদি মাউন্ট অভ লুনার দিকে বেঁকে যায়, এবং যদি সেখানে স্টার থাকে তা হলে ভয়াবহ ব্যাপার। এটা সুইসাইডের চিহ্ন।

'কে বলেছে?"

'কাউন্ট লুইস হ্যামন বলেছেন।'

'তিনি আবার কে?'

'তার নিক নেম কিরো। কিরোর নামও শোনেননি—সমানে মানুষের হাত দেখে বেড়াচ্ছেন। এত ভাওতাবাজি শিখেছেন কোথায়?'

বদুমিয়ার অ্যাসিসটেন্ট চা নিয়ে ঢুকছে। কোকের বোতলভরতি এক বোতল চা । সঙ্গে দুটা খালি কাপ । সে বোতল এবং কাপ নামিয়ে চলে গেল । মরিয়ম শীতল গলায় বলল, এই নোংরা চা আমি মরে গেলেও খাব না। আপনি খান। আপনাকে হাতও দেখতে হবে না। আমি চলে যাচ্ছি।'

'তুই চলে যাবি?'

'হ্যাঁ, চলে যাব। আপনার এখানে আসাটাই ভুল হয়েছে। বকবক করে শুধুশুধু সময় নষ্ট করলাম। আপনি প্রথম শ্রেণীর ভণ্ড।'

মরিয়ম উঠে দাড়াল। চোখে সানগ্রাস পরল। বোঝাই যাচ্ছে সে আহত হয়েছে।

'হিমু ভাই।'

'বল ।'

'হাত দেখাবার জন্যে আমি কিন্তু আপনার কাছে আসিনি। হাত আমি নিজে খুব ভালোই দেখতে পারি। আমি অন্য একটা কারণে এসেছিলাম । কারণটা জানতে চান?'

'চাই ।"

'ঐ দিন আপনাকে দেখে শকের মতো লাগল। হতভম্ব হয়ে ভেবেছি কী করে আপনার মতো মানুষকে আমি আমার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটা লিখলাম। এত বড় ভুল কী করে করলাম?'

'ভুলটা কত বড় তা ভালোমতো জানার জন্যে আবার এসেছিস?

'হ্যাঁ । আমার চিঠিটা নিশ্চয়ই আপনার কাছে নেই। থাক, মাথা চুলকাতে হবে না । আপনি কোনো একসময় বাবাকে গিয়ে দেখে আসবেন । তিনি আপনাকে খুব পছন্দ করেন সেটা তো আপনি জানেন- জানেন না?'

'জানি। যাব, একবার গিয়ে দেখে আসব। চল তোকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি ।'

'আপনাকে আসতে হবে না। আপনি না এলেই আমি খুশি হব। আপনি বরং কোকের বোতলের চা শেষ করে কাঁথা গায়ে দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ুন।'

মরিয়ম গটগট করে চলে গেল ! আমি কোকের বোতলের চা সবটা শেষ করলাম । কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে। চায়ে আফিং-টাফিং দেয় কি না কে জানে! শুনেছি ঢাকার অনেক চায়ের দোকানে চায়ের সঙ্গে সামান্য আফিং মেশায় । এতে চায়ের বিক্রি ভালো হয় । মনে হয়

বদুও তা-ই করে । পুরো এক বোতল চা খাওয়ায় ঝিমুনির মতো লাগছে। দ্বিতীয় দফা ঘুমের জন্যে আমি বিছানায় উঠে পড়লাম। বিছানায় ওঠামাত্র হাই উঠল। হাই-এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল—শরীরে অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে, শরীর তা-ই জানান দিচ্ছে। আর অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হচ্ছে-আমার ঘুম পাচ্ছে। এই মুহূর্তে অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটাই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হচ্ছে ।

অনেকেই আছে একবার ঘুম চটে গেলে আর ঘুমুতে পারে না। আমার সেই সমস্যা নেই। যে-কোনো সময় ঘুমিয়ে পড়তে পারি। মহাপুরুষদের ইচ্ছামৃত্যুর ক্ষমতা থাকে, আমার আছে ইচ্ছাঘুমের ক্ষমতা । যে-কোনো যে-কোনো পরিস্থিতিতে ইচ্ছে করলেই ঘুমিয়ে পড়া-এই ক্ষমতাও তো তুচ্ছ করার নয়। ও আচ্ছা, বলতে ভুলে গেছি,

আমার আরেকটা ক্ষমতা আছে- ইচ্ছাস্বপ্নের ক্ষমতা। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখতে পারি। যেমন ধরা যাক সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে- বিছানায় গা এলিয়ে কল্পনায় সমুদ্রকে দেখতে হবে । কল্পনা করতে করতে ঘুম এসে যাবে। তখন আসবে স্বপ্নের সমুদ্র। তবে কল্পনার সমুদ্রের সঙ্গে স্বপ্নের আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকবে ।

সমুদ্র কল্পনা করতে করতে পাশ ফিরলাম। ঘুম আসি-আসি করছে। অনেকদিন স্বপ্নে সমুদ্র দেখা হয় না। আজ দেখা হবে ভেবে খানিকটা উৎফুল্লও বোধ করছি- আবার একটু ভয়-ভয়ও লাগছে। আমার ইচ্ছাস্বপ্নগুলি কেন জানি শেষের দিকে খানিকটা ভয়ংকর হয়ে পড়ে। শুরু হয় বেশ সহজভাবেই— শেষ হয় ভয়ংকরভাবে । কে বলবে এর মানে কী! একজন কাউকে যদি পাওয়া যেত যে সব প্রশ্নের উত্তর জানে, তা হলে চমৎকার হতো। ছুটে যাওয়া যেত তার কাছে। এরকম কেউ নেই- বেশিরভাগ প্রশ্নের উত্তর আমার নিজের কাছে খুঁজি। নিজে যে-প্রশ্নের জবাব দিতে পারি না সেই প্রশ্নগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলে দিই। ডাস্টবিনের মরা বিড়াল, পচাগলা খাবার, মেয়েদের স্যানিটারি ন্যাপকিনের সঙ্গে

প্রশ্নগুলিও পড়ে থাকে। আমরা ভাবি প্রশ্নগুলিও একসময় পচে যাবে- মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি এসে নিয়ে যাবে। কে জানে নেয় কি না।

আমি পাশ ফিরলাম। ঘুম আর স্বপ্ন দুটাই একসঙ্গে এসেছে।

আমার স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমি স্বপ্ন দেখার সময় বুঝতে পারি যে স্বপ্ন দেখছি এবং মাঝেমধ্যে স্বপ্ন বদলে ফেলতেও পারি। যেমন ধরা যাক, খুব ভয়ের একটা স্বপ্ন দেখছি- অনেক উচু থেকে শাঁইশাঁই করে নিচে পড়ে যাচ্ছি। শরীর কাঁপছে।তখন হুট করে স্বপ্নটা বদলে অন্য স্বপ্ন করে ফেলি। স্বপ্নের মধ্যে ব্যাখ্যাও করতে পারি— স্বপ্নটা কেন দেখছি।

আজ দেখলাম মরিয়মের বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবকে (তাকে দেখা খুব স্বাভাবিক— একটুক্ষণ আগেই মরিয়মের সঙ্গে তার কথা হচ্ছিল)। মরিয়ম তাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কারণ তিনি অন্ধ। এটা কেন দেখলাম বুঝতে পারছি না। আসাদুল্লাহ সাহেব অন্ধ না। আসাদুল্লাহ সাহেবকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়া হলো । তখন তার মুখটা হয়ে গেল পত্রলেখক আসগর সাহেবের মতো (এটা কেন হলো বোঝা গেল না। স্বপ্ন অতি দ্রুত জটিল হয়ে যায়। খুব জটিল হলে স্বপ্ন হাতছাড়া হয়ে যায়- তখন আর তার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মনে হচ্ছে স্বপ্ন জটিল হতে শুরু করেছে।)

মরিয়ম তার বাবার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল (যদিও ভদ্রলোককে এখন দেখাচ্ছে পুরোপুরি আসগর সাহেবের মতো)। মরিয়ম বলল, আমার বাবা পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন। যার যা প্রশ্ন আছে, করুন। আমাদের হাতে সময় নেই। একেবারেই সময় নেই। যে-কোনো সময় রমনা থানার ওসি চলে আসবেন । তিনি আসার আগেই প্রশ্ন করতে হবে। কুইক, কুইক কে প্রথম প্রশ্ন করবেন? কে, কে?

আমি বুঝতে পারছি স্বপ্ন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে । সে এখন চলবে তার নিজস্ব অদ্ভুত নিয়মে। আমি তার পরেও হাল ছেড়ে দিলাম না, হাত ওঠালাম।

মরিয়ম বলল, আপনি প্রশ্ন করবেন?

'জি ।'

'আপনার নাম এবং পরিচয় দিন।'

'আমার নাম হিমু। আমি মহাপুরুষ।'

'আপনার প্রশ্ন কী বলুন। বাবা আপনার প্রশ্নের জবাব দেবেন।'

মহাপুরুষ হবার প্রথম শর্ত কী?'

আসাদুল্লাহ সাহেব উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি মহাপুরুষ হবার শর্ত বলা শুরু করেছেন। তার গলার স্বর ভারি এবং গম্ভীর। খানিকটা প্রতিধ্বনি হচ্ছে । মনে হচ্ছে পাহাড়ের গুহার ভেতর থেকে কথা বলছেন—

একেক যুগের মহাপুরষরা একেক রকম হন। মহাপুরুষদের যুগের সঙ্গে তাল বড় জাদুকর তাদের অদ্ভুত সব জাদু দেখিয়ে বেড়াতেন। কাজেই সেই যুগে মহাপুরুষ পাঠানো হলো জাদুকর হিসেবে । হজরত মুসার ছিল অসাধারণ জাদু-ক্ষমতা । তার হাতের লাঠি ফেলে দিলে সাপ হয়ে যেত। সে-সাপ অন্য জাদুকরদের সাপ খেয়ে ফেলত।

হজরত ইউসুফের সময়টা ছিল সৌন্দর্যের । তখন রূপের খুব কদর ছিল। হজরত ইউসুফকে পাঠানো হলো অসম্ভব রূপবান মানুষ হিসেবে।

হজরত ঈসা আলায়হেস সালামের যুগ ছিল চিকিৎসার । নানান ধরনের অষুধপত্র তখন বের হলো । কাজেই হজরত ঈসাকে পাঠানো হলো অসাধারণ চিকিৎসক হিসেবে । তিনি অন্ধত্ব সারাতে পারতেন। বোবাকে কথা বলার ক্ষমতা দিতে পারতেন।

বর্তমান যুগ হচ্ছে ভণ্ডামির। কাজেই এই যুগে মহাপুরুষকে অবশ্যই ভণ্ড হতে হবে ।

হাততালি পড়ছে। হাততালির শব্দে মাথা ধরে যাচ্ছে। আমি চেষ্টা করছি স্বপ্নের হাত থেকে রক্ষা পেতে। এই স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগছে না। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙছে না।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০৬

ফুপা টেলিগ্রামের ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছেন–

Emergency come sharp.

চিঠি নিয়ে এসেছে তার অফিসের পিওন। সে যাচ্ছে না, চিঠি হাতে দিয়ে চোখমুখ শক্ত করে দাড়িয়ে আছে। আমি বললাম, কী ব্যাপার?

সে শুকনা গলায় বলল, বখশিশ ।

'বখশিশ কিসের? তুমি ভয়ংকর দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছ। তোমকে যে ধরে মার লাগাচ্ছি না এই যথেষ্ট । ভালো খবর আনলে বখশিশ পেতে। খুবই খারাপ সংবাদ ।'

'রিকশা-ভাড়া দেন। যামু ক্যামনে?'

'পায়দল চলে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে দৃশ্য দেখতে দেখতে যাবে। তা ছাড়া রিকশাভাড়া দিলেও লাভ হবে না— আজ রিকশা চলছে না। ভয়াবহ হরতাল ।

'রিকশা টুকটাক চলতাছে।'

'টুকটাক যেসব রিকশা চলছে তাতে চললে বোমা খাবে। জেনেশুনে কাউকে কি বোমা খাওয়ানো যায়? তুমি কোন দল কর?'

'কোনো দল করি না।'

'বল কী! আওয়ামী লীগ, বিএনপি না?'

'জ্বে না।'

'ভোট কাকে দাও?'

'ভোট দেই না ।'

'তুমি তা হলে দেখি নির্দলীয় সরকারের লোক। এরকম তো সচরাচর পাওয়া যায় না! নাম কী তোমার?'

‘মোহাম্মদ আবদুল গফুর।’

‘গফুর সাহেব, রিকশা-ভাড়া তোমাকে দিচ্ছি। আমার কাছে একটা পয়সা নেই। ধার করে এনে দিতে হবে। ভাড়া কত?’

‘কুড়ি টাকা ।’

‘বল কী! এখান থেকে মতিঝিল কুড়ি টাকা?’

‘হরতালের টাইমে রিকশা-ভাড়া ডাবল ।’

‘তা তো বটেই। দাঁড়াও, আমি টাকা জোগাড় করে আনি। তবে একটা কথা বলি—কুড়ি টাকা পকেটে নিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে যাবে। রিকশায় উঠলেই বোমা খাবে।’

গফুর রাগি-রাগি চোখে তাকাল। আমি মধুর ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বললাম, আমি আসলে একজন মহাপুরুষ । ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাই । এইজন্যে সাবধান করে দিচ্ছি।

‘জ্বে আচ্ছা।’

মোহাম্মদ আবদুল গফুর মুখ বেজার করে বসে রইল। আমি মেসের ম্যানেজারের কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করলাম। মেস-ম্যানেজারের মুখ বেজার হয়ে গেল । মোহাম্মদ আবদুল গফুরের মুখে হাসি ফুটল। এখন এই মেস-ম্যানেজার তার বেজার ভাব অন্যজনের উপর ঢেলে দেবে । সে আবার আরেকজনকে দেবে। বেজার ভাব চেইন রিঅ্যাকশনের মতো চলতে থাকবে । আনন্দ চেইন রিঅ্যাকশনে প্রবাহিত করা যায় নানিরানন্দ করা যায়।

ফুপার চিঠি-হাতে ঝিম ধরে খানিকক্ষণ বসে কাটালাম। ঘটনা কী আঁচ করতে চেষ্টা করলাম। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাদল কি দেশে? ছুটি কাটাতে এসে বড় ধরনের কোনো ঝামেলা বাধিয়েছে এইটুকু অনুমান করা যায়। বাদল উদ্ভট কিছু করছে, কেউ তাকে সামলাতে পারছে না। ওঝা হিসেবে আমার ডাক পড়েছে। আমি মন্ত্র পড়লেই কাজ দেবে,

কারণ বাদলের কাছে আমি হচ্ছি ভয়াবহ ক্ষমতাসম্পন্ন এক মহাপুরুষ। আমি যদি সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলি, এই ব্যাটা সূর্য, দীর্ঘদিন তো পূর্ব দিকে উঠলি- এবার একটু পশ্চিম দিকে ওঠ-পূর্ব দিকে তোর উদয় দেখতে দেখতে বিরক্তি ধরে গেছে- তা হলে সূর্য তৎক্ষণাৎ আমার কথা শুনে পশ্চিম দিকে উঠবে।

বাদল শুধু যে বুদ্ধিমান ছেলে তা না, বেশ ছেলে । মারিয়ার সাংকেতিক চিঠির পাঠোদ্ধার করতে তার তিন মিনিট লেগেছে। এই ছেলে আমার সম্পর্কে কী ধারণা করে কী করে আমি জানি না। আমি যদি হিমু-ধর্ম নামে নতুন কোনো ধর্মপ্রচার শুরু করি তা হলে অবশ্যই সে হবে আমার প্রথম শিষ্য। এবং এই ধর্ম প্রচারের জন্য সে হবে প্রথম শহীদ। বাদল ছাড়াও কিছু শিষ্য পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। আসগর সাহেব শিষ্য হবেন। ধর্মে মুগ্ধ হয়ে হবেন তা না- ভদ্রলোক শিষ্য হবেন আমাকে খুশি করার জন্যে। কোনোরকম কারণ ছাড়া তিনি আমার প্রতি অন্ধ একটা টান অনুভব করেন। আসগর সাহেব ছাড়া আর কেউ কি শিষ্য হবে? কানা কুদ্দুস কি হবে? সম্ভাবনা আছে। সেও আমাকে পছন্দ করে। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানুষ মারতে কেমন লাগে কুদ্দুস? |

সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাই তুলতে তুলতে বলল, ভালোমন্দ কোনোরকম লাগে না।

‘বটি দিয়ে লাউ কাটতে যেমন লাগে তেমন “কচ” একটা শব্দ?’

‘ঠিক সেইরকম না ভাইজান। মরণের সময় মানুষ চিল্লাফাল্লা কইরা বড় ত্যক্ত করে। লাউ তো আর চিল্লাফাল্লা করে না।’

‘তা তো বটেই। চিল্লাফাল্লার জন্যে খারাপ লাগে?’

‘জি না, খারাপ লাগে না। চিল্লাফাল্লাটা করবই। মৃত্যু বলে কথা! মৃত্যু কোনো সহজ ব্যাপার না। ঠিক বললাম না?’

‘অবশ্যই ঠিক । কুদ্দুস মিয়া উদাস ভঙ্গিতে বলল, আপনেরে কেউ ডিসটার্ব করলে নাম-ঠিকানা দিয়েন।

‘নাম-ঠিকানা দিলে কী করবে? “কচ” ট্রিটমেন্ট? কচ করে লাউ-এর মতো কেটে ফেলবে?’

‘সেইটা আমার বিষয়, আমি দেখব। আফনের কাম নাম-ঠিকানা দেওন।

‘আচ্ছা, মনে থাকল।’

‘আরেকটা ঠিকানা দিতেছি। ধরেন কোনো বিপদে পড়ছেন— পুলিশ আফনেরে খুঁজতেছে। আশ্রয় দরকার-দানাপানি দরকার। এই ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া বলবেন, আমার নাম হিমু। ব্যবস্থা হবে। আমি অ্যাডভান্স আফনের কথা বইল্যা রাখছি। বলছি হিমু ভাই আমার ওস্তাদ।’

‘আমি হিমু’ এই কথাটা কাকে বলতে হবে?’

দরজায় তিনটা টোকা দিয়া একটু থামবেন, আবার তিন টোকা...এই হইল সিগনাল— তখন যে দরজা খুলব তারে বলবেন ।’

‘দরজা কে খুলবে?’

‘আমার মেয়েমানুষ দরজা খুলব। নাম জয়গুন । চেহারা বড় বেশি বিউটি। মনে হবে সিনেমার নায়িকা ।’

‘খুব মোটাগাটা?’

‘গিয়া একবার দেইখা আইসেন- এমন সুন্দর, দেখলে মনে হয় গল টিপা মইরা ফেলি।’

‘গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছা করে কেন?’

‘এইসব মেয়েছেলে সবের সাথেই রংঢং করে। আফনে একটা বিশিষ্ট ভদ্রলোক–বিপদে পইড়া তার এইখানে আশ্রয় নিছেন। তা হারামি মেয়েছেলে করব কী জানেন? আফনের সাথে দুনিয়ার গফ করব। কাপড়চোপড় থাকব আউলা। ইচ্ছা কইরা আউলা। ব্লাউজ যেটা পরব তার দুইটা বোতাম নাই। বোতাম ছিল- ইচ্ছা কইরা ছিঁড়ছে। এমন হারামি মেয়ে!’

নতুন হিমু-ধর্মে কুদ্দুসের সেই হারামি মেয়েটা কি ঢুকবে? তার সঙ্গে এখনও পরিচয় হয়নি। একদিন পরিচয় করে আসতে হবে। একটা ধর্ম শুরু করলে সেখানে রূপবতী মহিলা (যাদের ব্লাউজের দুটা বোতাম ইচ্ছা করে ছেড়া) না থাকলে অন্যরা আকৃষ্ট হবে না।

মারিয়াকে কি পাওয়া যাবে? মনে হয় না । মারিয়া-টাইপ মেয়েদের কখনোই আসলে পাওয়া যায় না। আবার ভুল করলাম— কোনো মেয়েকেই আসলে পাওয়া যায় না। তারা অভিনয় করে সঙ্গে আছে এই পর্যন্তই। অভিনয় শুধু যে অতি প্রিয়জনদের সঙ্গে করে তা না, নিজের সঙ্গেও করে। নিজেরা সেটা বুঝতে পারে না ।

আমি ফুপার বাসার দিকে রওনা হলাম এমন সময়ে যেন দুপুরে ঠিক খাবার সময় উপস্থিত হতে পারি। দুমাস খরচ দেয়া হয়নি বলে মেসে মিল বন্ধ হয়ে গেছে। দুবেলা খাবার জন্যে নিত্যনতুন ফন্দিফিকির বের করতে হচ্ছে। দুপুরের খাবারটা ফুপার ওখানে সেরে রাতে যাব মেডিকেল কলেজ আসগর সাহেবকে দেখতে। আসগর সাহেবের অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি কিছুই খেতে পারেন না। তাকে দেয়া হাসপাতালের খাবারটা খেয়ে নিলে রাত পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। খুব বেশি সমস্যা হলে কানা কুদ্দুসের মেয়েছেলে, দুটা বোতামবিহীন নায়িকা জয়গুন তো আছেই।

আজ বৃহস্পতিবার হাফ অফিস। ফুপাদের বাসায় গিয়ে দেখি সবাই টেবিলে খেতে বসেছে। সবার সঙ্গে ফুপাও আছেন। তার মুখ সবসময় গম্ভীর থাকে। আজ আরও গম্ভীর। তার চিঠি পেয়েই আমি এসেছি, তার পরেও তিনি এমন ভঙ্গি করলেন যেন আমাকে দেখে তার ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে।

শুধু বাদল চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। বিকট চিৎকার দিল, আরে হিমুদা, তুমি! তুমি কোথেকে?

ফুপু বিরক্ত গলায় বললেন, তোর ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে আকাশ থেকে নেমে এসেছে। খাওয়া ছেড়ে উঠে দাড়িয়েছিস কেন? বোস।

বাদল বসল না । ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে রইল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম–তারপর, সব খবর ভাল? মনে হচ্ছে তুই ছুটিতে দেশে এসে আটকা পড়েছিস?

কেউ কিছু বলল না, শুধু বাদল বলল, এতদিন পর তোমাকে দেখছি–কী যে ভালো লাগছে! তুমি হাত ধুয়ে খেতে বসো। মা, হিমুদাকে প্লেট দাও। আর একটা ডিম ভেজে দাও। হিমু দা ডিমভাজা খুব পছন্দ করে। ফার্মের ডিম না মা, দেশি মুরগির ডিম।

ফুপু বিরক্ত গলায় বললেন, খামোক কথা বলবি না বাদল। কথা বলে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছিস । ভাত খা। ঘরে পাচ-ছ' পদ তরকারি, এর মধ্যে আবার ডিম ভাজতে হবে? কাজের লোক নেই, কিছু নেই।

বাদল বলল, আমি ভেজে নিয়ে আসছি। হিমুদা, তুমি হাত ধুয়ে টেবিলে বসো ।

আমি হাত ধুয়ে টেবিলে বসলাম। বাদল তার মা-বাবার অগ্নিদৃষ্টি উপেক্ষা করে সত্যি সত্যি ডিম ভাজতে গেল ।

কাপে ডিম ফেটছে। চামচের শব্দ আসছে।

আমি টেবিলে বসতে বসতে ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদলের সমস্যাটা কী? আপনি যে আমাকে চিঠি দিয়েছেন, বাদলের জন্যেই তো দিয়েছেন। কী করছে সে? চিকিৎসা করতে হলে রোগটা ভালোমতো জানা দরকার ।

ফুপা বললেন, হারামজাদা দেশদরদি হয়েছে। অসহযোগের কারণে দেশ ধ্বংস হচ্ছে এই চিন্তায় হারামজাদার মাথা শট সার্কিট হয়ে গেছে। সে অনেক চিন্তাভাবনা করে সমস্যা থেকে বাচার বুদ্ধি বের করেছে।

আমি আনন্দিত গলায় বললাম, এটা তো ভালো! দেশের সব চিন্তাশীল মানুষই এই সময় দেশ ঠিক করার পদ্ধতি নিয়ে ভাবছেন। মানববন্ধন-ফন্ধন কীসব যেন করছেন। হাত ধরাধরি করে শুকনা মুখে দাড়িয়ে থাকা। বাদলের পদ্ধতিটা কী?

ফুপা বললেন, গাধার পদ্ধতি তো গাধার মতোই।

'কীরকম সেটা? রাজপথে চার পায়ে হামাগুড়ি দেবে? হামাগুড়ি দিতে দিতে সচিবালয়ের দিকে যাবে?'

'সেটা করলেও তো ভালো ছিল–গাধাটা ঠিক করেছে জিরো পয়েন্টে গিয়ে রাজনীতবিদদের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্যে সে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেবে ।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। বেকুবটা দুশো তেত্রিশ টাকা দিয়ে একটিন কেরোসিন কিনে এনেছে। তার ঘরে সাজানো আছে। তুই এখন এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে যা।"

'কেরোসিন কেনা হয়ে গেছে?'

'হ্যা, হয়ে গেছে।'

'দেখি কী করা যায়।'

আমি খাওয়া শুরু করলাম। বাদল ডিম ভেজে হাসিমুখে উপস্থিত হলো। আমি বললাম, কী রে, তুই নাকি গায়ে আগুন দিচ্ছিস?

বাদল উজ্জ্বল মুখে বলল, হ্যাঁ হিমুদা। আইডিয়াটা পেয়েছি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে। আত্মাহুতি। পত্রপত্রিকায় নিউজটা ছাপা হলে রাজনীতিবিদরা একটা ধাক্কা খাবেন । দুই নেত্রীই বুঝবেন— পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে । তাঁরা তখন আলোচনায় বসবেন।

ফুপা তিক্ত গলায় বললেন, দুই নেত্রীর বোঝার হলে আগেই বুঝত। এই পর্যন্ত তো কম মানুষ মরেনি! তুই তো প্রথম না!

আমি বললাম, এইখানে আপনি একটা ভুল করছেন ফুপা । বাদল প্রথম তো বটেই। এম্নিতেই মানুষ মরছে পুলিশের গুলিতে, বোমাবাজিতে- কিন্তু আত্মাহুতি তো এখনও হয়নি। বাদলই হলো প্রথম। পত্রিকায় ঠিকমতো জানিয়ে দিলে এরা ফটোগ্রাফার নিয়ে থাকবে। সিএনএন-কে খবর দিলে ক্যামেরা চলে আসবে। বিবিসি, ভয়েস অভ আমেরিকা সবাই নিউজ কাভার করবে। এতে একটা চাপ তৈরি হবে তো বটেই।

ফুপা-ফুপু দুজনেই হতভম্ব হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তাঁদের হতভম্ব দৃষ্টি উপেক্ষা করে বাদলকে বললাম, বাদল, তোর আইডিয়া পছন্দ হয়েছে।

'সত্যি পছন্দ হয়েছে হিমুদা?'

'অবশ্যই পছন্দ হয়েছে। দেশমাতৃকার জন্যে জীবনদান সহজ ব্যাপার তো না। তবে শোন, কেরোসিন ঢালার সঙ্গে সঙ্গে আগুন দিবি । কেরোসিন হচ্ছে ভলাটাইল-উদ্ধায়ী । সঙ্গে সঙ্গে আগুন না দিলে উড়ে চলে যাবে- আগুন আর ধরবে না। আর একটা ব্যাপার বলা দরকার— শুধু একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আগুন ধরালে লাভ হবে না। লোকজন থাবাটাবা দিয়ে নিভিয়ে ফেলবে। তুই আলুপোড়া হনুমান হয়ে যাবি কিন্তু মরবি না। তোকে যা করতে হবে তা হলো কেরোসিন ঢালার আগে দুটা গেঞ্জি, দুটা শার্ট পরতে হবে।'

বাদল কৃতজ্ঞ গলায় বলল, থ্যাংক য়ু হিমুদা। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে তো বিরাট ঝামেলায় পড়তাম ।

'এখন বল আত্মাহুতির তারিখ কবে ঠিক করেছিস ।'

'আমি কিছু ঠিক করিনি। তুমি বলে দাও। তুমি যেদিন বলবে সেদিন।'

'দেরি করা ঠিক হবে না। তুই দেরি করলি, আর দেশ অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়ে গেল, আর্মি এসে ক্ষমতা নিয়ে নিল- এটা কি ঠিক হবে?'

'না, ঠিক হবে না। হিমুদা, আগামীকাল বা পরশু?'

ফুপা-ফুপু দুজনেই খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। ফুপু যে-দৃষ্টি নিক্ষেপ করছেন সেই দৃষ্টির নিক নেম হলো অগ্নিদৃষ্টি। দুশো তেত্রিশ টাকা দামের কেরোসিন টিনের সবটুকু আগুন এখন তার দুই চোখে। আমি তার অগ্নিদৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গম্ভীর গলায় বাদলকে বললাম, যা করার দুএকদিনের মধ্যেই করতে হবে। হাতে আমাদের সময় অল্প । এর মধ্যেই তোর নিজের কাজ সব গুছিয়ে ফেলতে হবে।

'আমার আবার কাজ কী?'

'আত্মীয়স্বজন সবার বাড়িতে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নেয়া। পা ছুঁয়ে সালাম করা। সবার দোয়া নেয়া। এসএসসি পরীক্ষার আগে ছেলেমেয়েরা যা করে- বাড়ি-বাড়ি দিয়ে দোয়াভিক্ষা।'

'এই সব ফরমালিটিজ আমার ভালো লাগে না হিমুদা।'

'ভালো না লাগলেও করতে হবে। আত্মীয়স্বজনদের একটা সাধ-আহ্লাদ তো আছে। তোর চিন্তার কারণ নেই। আমি সঙ্গে যাব।'

'তুমি সঙ্গে গেলে যাব।'

আমি ফুপার দিকে তাকিয়ে বললাম, বাদলের জন্য অ্যাডভান্স কুলখানি করলে কেমন হয় ফুপা? সবাইকে খবর দিয়ে একটা কুলখানি করে ফেললাম। ওনলি ওয়ান আইটেম— কাচ্চি বিরিয়ানি । বাদল নিজে উপস্থিত থেকে সবাইকে খাওয়াল। নিজের কুলখানি নিজে খাওয়াও একটা আনন্দের ব্যাপার।

ফুপ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ভয়ংকর কিছু করে ফেলবেন কি না কে জানে কইমাছের ঝোলের বাটি আমার দিকে ছুঁড়ে ফেললে বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমি বাটি নিজের দিকে টেনে নিলাম ।

বিকেলে বাদলকে নিয়েই বের হলাম। দু-একজন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করে হাসপাতালে আসগর সাহেবকে দেখতে যাব। বাদলকে অত্যন্ত প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। বড় কিছু করতে পারার আনন্দে সে ঝলমল করছে।

'বাদল!'

'জি।'

'তোর কাছে টাকা আছে?'

'একশো বিয়াল্লিশ টাকা আছে।'

'তা হলে চল, আমাকে শিককাবাব আর নানরুটি কিনে দে।"

'কেন?'

'একজনকে শিককাবাব আর নানরুটির দাওয়াত দিয়েছি। টাকার অভাবে কিনতে পারছি না।'

'কাকে দাওয়াত দিয়েছ?'

'একটা কুকুরকে । কাওরান বাজারে থাকে। পা খোঁড়া। আমার সঙ্গে খুব খাতির।'

অন্য কেউ হলে আমার কথায় বিস্মিত হতো। বাদল হলো না। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এদের সঙ্গে আমার ভাব তো থাকবেই। আমি তো সাধারণ কেউ না ।

'হিমুদা!'

'বল।'

'তোমার একটা জিনিস আমার কাছে আছে। তুমি এটা নিয়ে নিও। মরে গেলে তুমি পাবে না ।"

'আমার কী আছে তোর কাছে?'

'ঐ যে পাঁচ বছর আগে একটা সাংকেতিক চিঠি দিয়েছিলে! মরিয়া নামের একটা মেয়ে তোমাকে লিখেছিল।'

'ঐ চিঠি এখনও রেখে দিয়েছিস?'

'কী আশ্চর্য! তোমার একটা জিনিস তুমি আমার কাছে দিয়েছ আর আমি সেটা ফেলে দেব! তুমি আমাকে কী ভাব?'

'সাংকেতিক চিঠি তুই এত চট করে ধরে ফেললি কী করে বল তো? এই ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না।'

বাদল আনন্দিত গলায় বলল, খুব সোজা । আমি তোমাকে বললাম, যে চিঠি দিয়েছে তার নাম কী? তুমি বললে, মারিয়া। কাজেই চিঠির শেষে তার নাম থাকবে। চিঠির শেষে লেখা ছিল NBSJB. (অর্থাৎ M-এর জায়গায় মেয়েটা লিখেছে N, A-র জায়গায় লিখেছে B.যেখানে R হবার কথা সেখানে লিখেছে S) মেয়েটা করেছে কী জান- যে-অক্ষরটা লেখার কথা সেটা না লিখে তার পরেরটা লিখেছে। এখন বুঝতে পারছ?

'পারছি।'

চিঠিতে সে কী লিখেছিল তুমি জানতে চাওনি। বলব কী লিখেছে?

না। বাদল, একটা কথা শোন। তোর এত বুদ্ধি, কিন্তু তুই একটা সহজ জিনিস বুঝতে পারছিস না।'

'সহজ জিনিসটা কী?'

'আজ থাক, আরেকদিন বলব।'

শিককাবাব এবং নানরুটি কিনে এনেছি। কুকুরটাকে পাওয়া গেছে। সে আমাকে দেখেই ছুটে এসেছে। বাদলের দিকে প্রথমে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, তোর খাবার এনেছি, তুই আরাম করে খা। এ হচ্ছে বাদল অসাধারণ বুদ্ধিমান একটা ছেলে।

কুকুরটা বাদলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে দুবার ঘেউঘেউ করে খেতে শুরু করল।

আমি বললাম, মাংসটা আগে খা । নানরুটি খেয়ে পেট ভরালে পরে আর মাংস খেতে পারবি না।

কুকুরটা নানরুটি ফেলে মাংস খাওয়া শুরু করল। বাদল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, ও কি তোমার কথা বোঝে?

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, আমার ধারণা নিম্নশ্রেণীর পশুপাখি মানুষের কথা বোঝে। অতি উচ্চশ্রেণীর প্রাণী মানুষই শুধু একে অন্যের কথা বোঝে না। বেগম খালেদা জিয়া কী বলছেন তা শেখ হাসিনা বুঝতে পারছেন না। আবার শেখ হাসিনা কী বলছেন তা বেগম খালেদা জিয়া বুঝতে পারছেন না। আমরা দেশের মানুষ কী বলছি সেটা আবার তাঁরা বুঝতে পারছেন না। তাঁরা কী বলছেন তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার না।

বাদল বলল, কেন?

আমি যে নিবাস ফেলে বললাম, এই প্রশ্নের জবাব আমি জনি না। আসাদুল্লাহ সাহেব হয়তো জানেন ।

'আসাদুল্লাহ সাহেব কে?'

'যে-মেয়েটি আমাকে চিঠি লিখেছি তাঁর বাবা। আসাদুল্লাহ সাহেব পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন।'

কুকুরটা খেয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একবার খাওয়া বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে বিরক্তির ভঙ্গিতে লেজ নাড়ল । যেন বলল— এত খাবার তোমাকে কে আনতে বলেছে? আমি সামান্য পথের নেড়ি কুকুর । আমাকে এতটা মমতা দেখানো কী ঠিক হচ্ছে? আমাদের পশুজগতের নিয়ম খুব কঠিন। ভালোবাসা ফেরত দিতে হয়। মানুষ হয়ে তোমরা বেঁচে গেছ । তোমাদের ভালোবাসা ফেরত দিতে হয় না ।

আসগর সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো না । তাকে ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। চলে আসছি, দরজার কাছের বেড থেকে একজন ক্ষীণ স্বরে ডাকল, ভাইসাহেব!

আমি ফিরলাম ।

'আমারে চিনছেন ভাইসাহেব?'

'না ।'

'আমি মোহাম্মদ আব্দুল গফুর । আপনের কাছে চিঠি নিয়ে গেছিলাম। কুড়ি টাকা বখশিশ দিলেন |'

'খবর কী গফুর সাহেব?

'খবর ভালো না ভাইসাহেব । বোমা খাইছি। রিকশা কইরা ফিরতেছিলাম— বোমা মারছে।"

'রিকশায় উঠতে নিষেধ করেছিলাম...'

কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।'

'তা তো বটেই।'

'ঠ্যাং একটা কাইট্যা বাদ দিছে ভাইসাহেব ।'

'একটা তো আছে। সেটাই কম কী? নাই মামার চেয়ে কানা মামা |'

'ভাইসাহেব, আমার জন্যে একটু দোয়া করবেন ভাইসাহেব।'

'দেখি, সময় পেলে করব। একেবারেই সময় পাচ্ছি না। হাঁটাহাঁটি খুব বেশি হচ্ছে। গফুর সাহেব, যাই?'

গফুর তাকিয়ে আছে। গফুরের বিছানায় যে-মহিলা বসে আছেন তিনি বোধহয় গফুরের কন্যা। অসুস্থ বাবার পাশে কন্যার বসে থাকার দৃশ্যের চেয়ে মধুর দৃশ্য আরকিছু হতে পারে না। আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলরাম— 'মা যাই?'

মেয়েটি চমকে উঠল। আমি তাকে মা ডাকব এটা বোধহয় সে ভাবেনি ।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০৭

মারিয়ার বাবা আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বলাকা সিনেমা হলের সামনের পুরানো বইয়ের দোকানে। আমি দূর থেকে লক্ষ্য করলাম এক ভদ্রলোক পুরানো বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তাঁর হাতে চামড়ায় বাঁধানো মোটা একটা বই। তিনি খুবই অসহায় ভঙ্গিতে চারদিকে তাকাচ্ছেন, যেন জনতার ভেতর কাউকে খুঁজছেন। ভদ্রলোকের পরনে পায়জামা-পাঞ্জাবি, চোখে চশমা। ফটোসেনসিটিভ গ্লাস বলেই দুপুরের কড়া রোদে সানগ্লাসের মতো কালো হয়ে ভদ্রলোকের চোখ ঢেকে দিয়েছে। আমি ভদ্রলোকের দিকে কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম। হতভম্ব হবার প্রধান কারণ, এমন সুপুরুষ আমি অনেকদিন দেখিনি। সুন্দর পুরুষদের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। থাকলে বাংলাদেশ থেকে অবশ্যই এই ভদ্রলোককে পাঠানো যেত । চন্দ্রের কলঙ্কের মতো যাবতীয় সৌন্দর্যে খুঁত থাকে- আমি ভদ্রলোকের খুঁতটা কী বের করার জন্যে এগিয়ে গেলাম এবং তাকে চমকে দিয়ে বললাম, কেমন আছেন?

অপরিচিত কেউ কেমন আছেন বললে আমরা জবাব দিই না। হয় ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকি, কিংবা বলি, আপনাকে চিনতে পারছি না। এই ভদ্রলোক তা করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে বললেন, জি ভালো।

কাছে এসেও ভদ্রলোকের চেহারায় খুঁত ধরতে পারা গেল না। পঞ্চাশের মতো বয়স। মাথাভরতি চুল। চুলে পাক ধরেছে- মাথার আধাআধি চুল পাকা। এই পাকা চুলেই তাকে ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে- কুচকুচে কালো হলে তাকে মানাত না।

অসম্ভব রূপবতীদের বেলাতেও আমি এই ব্যাপারটা দেখেছি । তারা যখন যেভাবে থাকে- সেভাবেই তাদের ভালো লাগে। কপালে টিপ পরলে মনে হয়— আহ, টিপটা কী সুন্দর

লাগছে! টিপ না থাকলে মনে হয়- ভাগ্যিস এই মেয়ে অন্য মেয়েগুলির মতো কপালে টিপ দেয়নি। টিপ দিলে তাকে একেবারেই মানাত না ।

আমার ধারণা হলো— ভদ্রলোকের চোখে হয়তো কোনো সমস্যা আছে। হয়তো চোখ ট্যারা, কিংবা একটা চোখ নষ্ট । সেখানে পাথরের চোখ লাগানো। ফটোসেনসিটিভ সানগ্লাস চোখ থেকে না খোলা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাবে না। কাজেই আমাকে ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু সময় থাকতে হবে। এই সময়ের ভেতর নিশ্চয়ই তার চোখে ধুলাবালি পড়বে। চোখ পরিষ্কার করার জন্যে চশমা খুলবেন । যদি দেখি ভদ্রলোকের চোখও সম্রাট অশোক-পুত্র কুনালের চোখের মতো অপূর্ব, তা হলে আমার অনেকদিনের একটা আশা পূর্ণ হবে। আমি অনেকদিন থেকেই নিখুঁত রূপবান পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি। নিখুঁত রূপবতীর দেখা পেয়েছি- রূপবানের দেখা এখনও পাইনি।

আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে পরিচিত মানুষের মতো হাসলাম । তিনিও হাসলেন- তবে ব্যাকুল ভঙ্গিতে চারদিক তাকানো দূর হলো না। আমি বললাম, স্যার, কোনো সমস্যা হয়েছে?

তিনি বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, একটা সমস্যা অবিশ্যি হয়েছে। ভালো একটা পুরানো বই পেয়েছি–Holder-এর Interpretation of Consicence.অনেকদিন বইটা খুঁজছিলাম- হঠাৎ পেয়ে গেলাম ।

আমি বললাম, বইটা কিনতে পারছেন না? শর্ট পড়েছে?

তিনি বললেন, জি। কী করে বুঝলেন?

‘ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছে । আমার কাছে একশো একুশ টাকা আছে— এতে কি হবে?’

‘একশো টাকা হলেই হবে।’

আমি একশো টাকার নোট বাড়িয়ে দিলাম। ভদ্রলোক খুব সহজভাবে নিলেন। অপরিচিত একজন মানুষ তাঁকে একশো টাকা দিচ্ছে এই ঘটনা তাঁকে স্পর্শ করল না। যেন এটাই

স্বাভাবিক। ভদ্রলোক বই খুলে ভেতরের পাতায় আরেকবার চোখ বোলালেন- মনে হচ্ছে দেখে নিলেন মলাটে যে-নাম লেখা ভেতরেও সেই নাম কি না ।

বই বগলে নিয়ে ভদ্রলোক এগুচ্ছেন। আমি তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছি। তাঁর চোখ ভালোমতো না দেখে বিদেয় হওয়া যায় না। ভদ্রলোক হঠাৎ দাড়িয়ে পড়ে বললেন, আপনার নাম কী?

আমি বললাম, আমার নাম হিমালয় ।

ভদ্রলোক বললেন, সুন্দর নাম- হিমালয় । বললেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। হিমালয় নাম শুনে সবাই সামান্য হলেও কৌতুহল নিয়ে আমাকে দেখে, ইনি তাও দেখছেন না। যেন হিমালয় নামের অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে।

আমরা নিউ মার্কেটের কার পার্কিং এলাকায় গিয়ে পৌঁছলাম। তিনি সাদা রঙের বড় একটা গাড়ির দরজা খুলতে খুলতে বললেন, আসুন, ভেতরে আসুন।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, ভেতরে যাব কেন?

তিনি আমার চেয়েও বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার বাড়িতে চলুন, আপনাকে টাকা দিয়ে দেব। তারপর আমার ড্রাইভার আপনি যেখানে যেতে চান সেখানে পৌছে দেবে।

‘অসম্ভব! আমার এখন অনেক কাজ ।’

‘বেশ, আপনার ঠিকানা বলুন। আমি টাকা পৌঁছে দেব।’

‘আমার কোনো ঠিকানা নেই।’

‘সে কী!’

‘স্যার, আপনি বরং আপনার টেলিফোন নাম্বার দিন। আমি টেলিফোন করে একদিন আপনাদের বাসায় চলে যাব |’

‘কার্ড দিচ্ছি, কার্ডে ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সবই আছে।’

'কার্ড না দেওয়াই ভালো। আমার পাঞ্জাবির কোনো পকেট নেই। কার্ড হাতে নিয়ে ঘুরব, কিছুক্ষণ পর হাত থেকে ফেলে দেব। এরচে টেলিফোন নাম্বার বলুন, আমি মুখস্থ করে রেখে দি। আমার স্মৃতিশক্তি ভালো। একবার যা মুখস্থ করি তা ভুলি না।'

উনি টেলিফোন নাম্বার বললেন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠে বসলেন। তখনও তার হাতে বইটি ধরা। মনে হচ্ছে বই হাতে নিয়েই গাড়ি চালাবেন। আমি বললাম, স্যার, দয়া করে এক সেকেন্ডের জন্যে আপনি কি চোখ থেকে চশমাটা খুলবেন?

'কেন?'

ব্যক্তিগত কৌতূহল মেটাৰ। অনেকক্ষণ থেকে আমার মনে হচ্ছিল আপনার একটা চোখ পাথরের |'

উনি বিস্মিত হয়ে বললেন, এরকম মনে হবার কারণ কী? বলতে বলতে তিনি চোখ থেকে চশমা খুললেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর চোখ দেখলাম।

পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চোখ নিয়ে চারজন মানুষ জন্মেছিলেন- মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা, ট্রয় নগরীর হেলেন, অশোকের পুত্র কুনাল এবং ইংরেজ কবি শেলি। আমার মনে হলো- এই চারটি নামের সঙ্গে আরেকটি নাম যুক্ত করা যায়। ভদ্রলোকের কী নাম? আমি জানি না-ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞেস করা হয়নি। তার টেলিফোন নাম্বারও ইতিমধ্যে ভুলে গেছি। তাতে ক্ষতি নেই- প্রকৃতি তাকে কম করে হলেও আরও চারবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে। এইসব ব্যাপারে প্রকৃতি খুব উদার- পছন্দের সব মানুষকে প্রকৃতি কমপক্ষে পাঁচবার মুখোমুখি করে দেয়। মুখোমুখি করে মজা দেখে ।

কাজেই আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো চেষ্টা আর করলাম না। আমি থাকি আমার মতো- উনি থাকেন ওনার মতো। আমি ঠিক করে রেখেছি- একদিন নিশ্চয়ই আবার তার সঙ্গে দেখা হবে, তখন তার সম্পর্কে জানা যাবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে মানুষটা ইন্টারেস্টিং। বই-প্রেমিক। হাতে বইটা পাবার পর আশপাশের সবকিছু ভুলে গেছেন।

আমাকে সাধারণ ভদ্রতার ধন্যবাদও দেননি। আমি নিশ্চিত, আবার যখন দেখা হবে তখন দেবেন।

পরের বছর চৈত্রমাসের কথা (আমার জীবনের বড় বড় ঘটনা চৈত্রমাসে ঘটে। কে বলবে রহস্যটা কী?)- বেলা একটার মতো বাজে। ঝাঁঝাঁ রোদ উঠে গেছে। অনেকক্ষণ হেঁটেছি বলে শরীর ঘামে ভিজে গেছে। পাঞ্জাবির এমন অবস্থা যে দুহাতে চিপে উঠানের দড়িতে শুকোতে দেয়া যায়। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাবার উপক্রম। ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। চোখের সামনে ভাসছে বড় মাপের একটা গ্রাস। গ্লাসভরতি পানি। তার উপর বরফের কুচি। কাচের পানির জগ-হাতে আরেকজন দাড়িয়ে আছে। গ্লাস শেষ হওয়ামাত্র সে গ্লাস ভরতি করে দেবে। জগ-হাতে যে দাড়িয়ে আছে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না- শুধু হাত দেখা যাচ্ছে, ধবধবে ফরসা হাত। হাতভরতি লাল আর সবুজ কাচের চুড়ি। জগে করে পানি ঢালার সময় চুড়িতে রিনিঝিনি শব্দ উঠছে।

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। চৈত্রমাসের দুপুর ঢাকার রাজপথে পানির জগ-হাতে চুড়িপরা কোনো হাত থাকে না। আমি হাটতে হাটতে ভাবছি, কোনোদিন যদি প্রচুর টাকা হয় তা হলে চৈত্রমাসে ঢাকার রাস্তায়-রাস্তায় জলসত্র খুলে দেব। সেখানে হাসিখুশি তরুণীরা পথচারীদের বরফ-শীতল পানি খাওয়াবে। ট্যাপের পানি না- ফোটানো পানি। পানিবাহিত জীবাণু যে-পানিকে দূষিত করেনি সেই পানি। তরুণীদের গায়ে থাকবে আকাশি রঙ-এর শাড়ি। হাতভরতি লাল-সবুজ চুড়ি। চুড়ির লাল রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে ঠোঁটে থাকবে আগুন-রঙা লিপষ্টিক । তাদের চোখ কেমন হবে? তাদের চোখ এমন হবে যেন চোখের দিকে তাকালেই মনে হয়—

“প্রহর শেষের আলেয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।”

প্রচণ্ড রোদের কারণেই বোধহয় মরীচিক দেখার মতো ব্যাপার ঘটল। আমি চোখের সামনে জলসত্রের মেয়েগুলিকে দেখতে পেলাম। একজন না, চার-পাচ জন। সবার হাতেই পানির জগ । হাতভরতি লাল-সবুজ চুড়ি। আর তখন আমার পেছনে একটা গাড়ি থামল । গাড়ি থেকে মাথা বের তরুণীদের একজন বলল, এই যে শুনুন। কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম কি হিমালয়?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

'গাড়িতে উঠে আসুন। আমার নাম মারিয়া ।'

মেয়েটার বয়স তেরো-চোদ্দ, কিংবা হয়তো আরও কম। বাচ্চা মেয়েরা হঠাৎ শাড়ি পরলে অন্য একধরনের সৌন্দর্য তাদের জড়িয়ে ধরে। এই মেয়েটির বেলায়ও তা-ই হয়েছে। মেয়েটি জলসত্রের মেয়েদের নিয়মমতো আকাশি রঙের শাড়ি পরেছে। শাড়িপরা মেয়েদের কখনো তুমি বলতে নেই, তবু আমি গাড়িতে উঠতে উঠতে বললাম, কেমন আছ মারিয়া?

'জি ভালো আছি।'

'তোমার হাতে লাল-সবুজ চুড়ি নেই কেন?'

মারিয়া ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল, কিছু বলল না। আমি মেয়েটিকে চিনতে পারছি না–তাতে কিছু যায়-আসে না।

মারিয়া বলল, আপনি কি অসুস্থ?

'না ।'

আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ । আপনি তো আমাকে চেনেন না— আমি কে জানতে চাচ্ছেন না কেন?'

'তুমি কে?'

'আমি আসাদুল্লাহ সাহেবের মেয়ে।'

'ও আচ্ছা ।'

'আসাদুল্লাহ সাহেব কে তাও তো আপনি জানেন না!'

'না । উনি কে?'

'উনি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে আপনি একবার একশো টাকা ধার দিয়েছিলেন। মনে পড়েছে?'

'হ্যা, মনে পড়েছে।'

'যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হয় এখনও মনে পড়েনি। আপনি বাবাকে বলেছিলেন– তার একটা চোখ পাথরের— এখন মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমরা কি এখন তার কাছে যাচ্ছি? তাকে ঋণমুক্ত করার পরিকল্পনা?'

'না— তিনি দেশে নেই। বছরে মাত্র তিনমাস তিনি দেশে থাকেন। আপনার সঙ্গে দেখা হবার দুমাস পরই তিনি চলে যান। এই আপনি তার সঙ্গে যোগাযোগ করেননি বলে তিনি খুব আপসেট ছিলেন। তিনি চলে যাবার আগে আপনার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে বলে গিয়েছিলেন যদি আপনাকে আমি বের করতে পারি তা হলে দারুণ একটা উপহার পাব। তার পর থেকে আমি পথে বের হলেই হলুদ পাঞ্জাবি-পরা কাউকে জিজ্ঞেস করি— আপনার নাম কি হিমালয়? ভালো কথা, আপনি আসলেই হিমালয় তো?'

'হু— আমিই হিমালয় ।'

"প্রমাণ দিতে পারেন?"

'পারি— আপনার বাবা যে-বইটা কিনেছিলেন তার নাম- Interpretation of Conscience.'

বাবা বলেছিলেন- আপনি খুব অদ্ভুত মানুষ। আমার কাছে অবিশ্যি তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?'

'গুলশানের দিকে যাচ্ছি।'

গাড়ির ভেতরে এসি দেয়া- শরীর শীতল হয়ে আসছে। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি জেগে থাকতে । ঘুম আনার জন্যে মানুষ ভেড়ার পাল গোণে। ঘুম না-আসার জন্যে কিছু কি গোণার আছে? ভয়ংকর কোনো প্রাণী গুনতে শুরু করলে ঘুম কেটে যাবার কথা । আমি মাকড়সা গুণতে শুরু করলাম ।

একটা মাকড়সা, দুটা মকড়সা, তিনটা- চারটা, পাচটা । সর্বনাশ! পঞ্চাশটা আবার ব্ল্যাক উইডো মাকড়সা- কামড়ে সাক্ষাৎ মৃত্যু!

এত গোণাগুণি করেও লাভ হলো না । মারিয়াদের বাড়িতে যখন পৌছলাম তখন আমি গভীর ঘুমে অচেতন। মারিয়া এবং তাদের ড্রাইভার দুজন মিলে ডাকাডাকি করেও আমার ঘুম ভাঙাতে পারছে না।

মারিয়াদের পরিবারের সঙ্গে এই হচ্ছে আমার পরিচয়ের সূত্র। মারিয়ার বয়স তখন পনেরো। সেদিনই সে প্রথম শাড়ি পরে। শাড়ির রঙ বলেছি কি? ও হ্যাঁ, আগে একবার বলেছি। আচ্ছা আবারও বলি, শাড়ির রঙ জলসত্রের মেয়েদের শাড়ির মতো আকাশি নীল ।

ঘুম ভেঙে দেখি চোখের সামনে হুলস্থূল ধরনের বাড়ি। প্রথম দর্শনে মনে হলো বাড়িতে আগুন ধরে গেছে। বুকে একটা ছোটখাটো ধাক্কার মতো লাগল। পুরো বাড়ি বোগেনভিলিয়ার গাঢ় লাল রঙে ঢাকা । হঠাৎ ঘুম ভাঙায় ফুলের রঙকে আগুন বলে মনে হচ্ছিল ।

মারিয়া বলল, বাড়ির নাম মনে করে রাখুন- চিত্রলেখা। চিত্রলেখা হচ্ছে আকাশের একটা তারার নাম ।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

'আজ বাড়িতে কেউ নেই। মা গেছেন রাজশাহী ।'

আমি আবারও বললাম, ও আচ্ছা।

'আপনি কি টাকাটা নিয়ে চলে যাবেন, না একটু বসবেন?'

'টাকা নিয়ে চলে যাব।'

'বাড়ির ভেতরে ঢুকবেন না?'

'না ।'

'তা হলে এখানে দাঁড়ান।'

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মেয়েটা আগ্রহ করেই আমাকে এতদূর এনেছে, কিন্তু আমাকে বাড়িতে ঢোকানোর ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। আমি তাতে তেমন অবাক হলাম না। আমি লক্ষ করেছি বেশিরভাগ মানুষই আমাকে বাড়িতে ঢোকাতে চায় না। দরজার ওপাশে রেখে আলাপ করে বিদায় করে দিতে চায়। রাস্তায়-রাস্তায় দীর্ঘদিন লোকজনদের কেউ ঘরে ঢোকাতে চায় না। রাস্তা-ভাবের লোক রাস্তাতেই ভালো । কবিতা আছে না–

বন্যেরা বনে সুন্দর
শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

আমি সম্ভবত রাস্তাতেই সুন্দর।

'হিমালয় সাহেব!'

আমি তাকালাম। বাড়ির ভেতর থেকে মারিয়া ইন্সটিমেটিক ক্যামেরা-হাতে বের হয়েছে। বের হতে অনেক সময় নিয়েছে, কারণ সে শাড়ি বদলেছে। এখন পরেছে স্কার্ট। স্কার্ট পরায় একটা লাভ হয়েছে। মেয়েটা যে অসম্ভব রূপবতী তা পরিস্কার হয়ে গেছে।

শাড়িতে যেমন অপূর্ব লাগছিল স্কার্টেও তেমন লাগছে। দীর্ঘ সময় গেটের বাইরে রোদে দাড়িয়ে থাকার কষ্ট মেয়েটাকে দেখে একটু যেন কমল ।

'আপনি সূর্যকে সামনে রেখে একটু দাঁড়ান। মুখের উপর সানলাইট পড়ুক । আপনার ছবি তুলব। বাবাকে ছবির একটা কপি পাঠাতে হবে। ছবি দেখলে বাবা বুঝবেন যে, আমি আসল লোকই পেয়েছিলাম।'

'হাসব?'

'হ্যাঁ, হাসতে পারেন।'

'দাঁত বের করে হাসব, না ঠোঁট টিপে?'

'যেভাবে হাসতে ভালো লাগে সেভাবেই হাসুন । আর এই নিন টাকা ।'

মারিয়া একশো টাকার দুটা নোট এগায়ে দিল। দুটাই চকচকে নোট। বড়লোকদের সবই সুন্দর। আমি অল্প যে-ক'জন দারুণ বড়লোক দেখেছি তাদের কারও কাছেই কখনো ময়লা নোট দেখিনি। ময়লা নোটগুলি এরা কি ওয়াশিং মেশিনে ধুয়ে ইস্ত্রি করে ফেলে? নাকি ডাস্টবিনে ফেলে দেয়?

'আমি আপনার বাবাকে একশো টাকা দিয়েছিলাম।'

বাবা বলে দিয়েছেন যদি আপনার দেখা পাই তা হলে যেন দুশো টাকা দিই। কারণ, গ্রন্থসাহেব বই-এ গুরু নানক বলেছেন-

দুগুণা দত্তার

চৌগুণা জুজার।

দুগুণ নিলে চারগুণ ফেরত দিতে হয়। বাবা সামনের মাসের ১৫ তারিখের পর আসবেন । আপনি তখন এলে খুশি হবেন। আর বাবার সঙ্গে কথা বললে আপনার নিজেরও ভালো লাগবে।'

'আমার ভালো লাগবে সেটা কী করে বলছেন?'

'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। বাবার সঙ্গে যে পাচ মিনিট কথা বলে সে বারবার ফিরে আসে ।''

‘ও আচ্ছা ।’

‘ও আচ্ছা বলা কি আপনার মুদ্রাদোষ? একটু পরপর আপনি ও আচ্ছা বলছেন।’

‘কিছু বলার পাচ্ছি না বলে “ও আচ্ছা” বলছি।’

‘বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আসবেন তো?’

‘আসব।’

‘আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে- যে-প্রশ্নের জবাব আপনি জানেন না— সেই প্রশ্ন বাবার জন্যে নিয়ে আসতে পারেন। আমার ধারণা, আমার বাবা এই পৃথিবীর একমাত্র ব্যক্তি যিনি সব প্রশ্নের জবাব জানেন।’

আমি যথাসম্ভব বিস্মিত হবার ভঙ্গি করে বললাম-ও আচ্ছা!

মারিয়া বাড়িতে ঢুকে পড়ল। বাড়ির দারোয়ান গেট বন্ধ করে মোটা মোটা দুই তালা লাগিয়ে দিয়ে জেলের সেন্ট্রির মতো তালা টেনে টেনে পরীক্ষা করতে লাগল। আমি হাতের মুঠোয় দুটা চকচকে নোট নিয়ে চৈত্রের ভয়াবহ রোদে রাস্তায় নামলাম। মারিয়া একবারও বলল না–কোথায় যাবেন বলুন, গাড়ি আপনাকে পৌঁছে দেবে। বড়লোকদের ঠাণ্ডা গাড়ি মানুষের চরিত্র খারাপ করে দেয়- একবার চড়লে শুধুই চড়তে ইচ্ছা করে। ফিরতে ইচ্ছা করছে না ।

আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো আষাঢ় মাসে। বৃষ্টিতে ভিজে জবজবা হয়ে ওঁদের বাড়িতে গিয়েছি। দারোয়ান কিছুতেই ঢুকতে দেবে না। ভাগ্যক্রমে মারিয়া এসে পড়ল। বড়লোকরা বোধহয় কিছুতেই বিক্ষিত হয় না। কাকভেজা অবস্থায় আমাকে দেখেও একবারও জিজ্ঞেস করল না— ব্যাপার কী? সহজ ভঙ্গিতে সে আমাকে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে। বিশাল একটা ঘরে ভদ্রলোক খালিগায়ে বিছানায় বসে আছেন। অনেকটা পদ্মাসনের ভঙ্গিতে বসা । তাঁর চোখ একটা খোলা বইয়ের দিকে। দেখেই বোঝা যায়

ভদ্রলোক গভীর মনোযোগে বই পড়ছেন। আমরা দুজন যে ঢুকলাম তিনি বুঝতেও পারলেন না । মারিয়া বলল, বাবা, একটু তাকাবে?

ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ, তাকাব। বলার পরেও তাকালেন না। যে-পাতাটা পড়ছিলেন সে-পাতাটা পড়া শেষ করে বই উলটে দিয়ে তারপর তাকালেন। তাকিয়ে হেসে ফেললেন। আমি চমকে গেলাম। মানুষের হাসি এত সুন্দর হয়! তৎক্ষণাৎ মনে হল–ভাগ্যিস মেয়ে হয়ে জন্মাইনি। মেয়ে হয়ে জন্মলে এই ঘর থেকে বের হওয়া অসম্ভব হতো ।

'হিমালয় সাহেব না?'

'জি।'

'তুমি কেমন আছ?'

'জি ভালো।'

'বসো । খাটের উপর বসো ।'

'আমি কিন্তু স্যার ভিজে জবজবা।'

'কোনো সমস্যা নেই। বসো । মাথা মুছবে?'

'জি না স্যার। বৃষ্টির পানি আমি গায়ে শুকাই। তোয়ালে দিয়ে বৃষ্টির পানি মুছলে বৃষ্টির অপমান হয়।'

আমি খাটে বসলাম । ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ স্পর্শ করলেন ।

'তুমি কেমন আছ হিমালয়?'

'জি ভালো ।'

'ঐ দিন তোমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চলে এসেছিলাম- ধন্যবাদ পর্যন্ত দিইনি। আসলে মাথার মধ্যে সবসময় ছিল কখন বইটা পড়ব । জগতের চারপাশে তখন কী ঘটছিল তা আমার মাথায় ছিল না। ভালো কোনো বই হাতে পেলে আমার এরকম হয়।'

'বইটা কি ভালো ছিল?'

'আমি যতটা ভালো আশা করেছিলাম তারচে ভালো ছিল। এজাতীয় বই লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় না- পথেঘাটে পাওয়া যায়। আমি একবার পুরানো খবরের কাগজ কিনে এরকম ফেরিওয়ালার ঝুড়ি থেকে একটা বই জোগাড় করেছিলাম। বইটার নাম 'Dawn of Intelligence.' এইটিন নাইনটি টু-তে প্রকাশিত বই- অথর হচ্ছেন ম্যাক মাস্টার। রয়েল সোসাইটির ফেলো। চামড়া দিয়ে মানুষ বই বাঁধিয়ে রাখে- ঐ বইটা ছিল সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো ।'

মারিয়া বলল, বইয়ের কচকচানি শুনতে ভালো লাগছে না বাবা- আমি যাচ্ছি। তোমাদের চা বা কফি কিছু লাগলে বলো, আমি পাঠিয়ে দেব।

আসাদুল্লাহ সাহেব মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাদের চা দাও। আর শোনো হিমালয়, তুমি আমাদের সঙ্গে দুপুরে খাবে। তোমার কি আপত্তি আছে?

'জি না ।'

'তোমাকে কি একসেট শুকনো কাপড় দেব?'

'লাগবে না স্যার । শুকিয়ে যাবে।'

'তোমাকে দেখে এত ভালো লাগছে কেন বুঝতে পারছি না। মারিয়া, তুই বল তো এই ছেলেটাকে দেখে আমার এত ভালো লাগছে কেন?'

'তোমার ভালো লাগছে, কারণ, তুমি ধরে নিয়েছিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে না। তাকে ধন্যবাদ দিতে পারবে না। সাজীবন ঋণী হয়ে থাকবে। তুমি ঋণ শোধু করতে পেরে এইজনেই ভাল লাগছে।'

'ভেরি গুড-যতই দিন যাচ্ছে তোর বুদ্ধি চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছে।'

মারিয়া চা আনতে গেল। আমি আসাদুল্লাহ সাহেবকে বললাম, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব। আমি আসলে আপনাকে দেখতে আসিনি, প্রশ্নটা করতে এসেছি।

আসাদুল্লাহ সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কী প্রশ্ন?

‘এই জীবজগতে মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণী কি আছে যে আত্মহত্যা করতে পারে?’

‘আছে। লেমিং বলে একধরনের প্রাণী আছে। ইঁদুরগোত্রীয়। স্ত্রী-লেমিংদের বছরে দুটা বাচ্চা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে প্রতি চার বছর পরপর দুটার বদলে এদের বাচ্চা হয় দশটা করে। তখন ভয়ংকর সমস্যা দেখা দেয়। খাদ্যের অভাব, বাসস্থানের অভাব। এরা তখন করে কী- দল বেঁধে সমুদ্রের দিকে হাঁটা শুরু করে। একসময় সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। মিনিট দশেক মনের আনন্দে সমুদ্রের পানিতে সাঁতরায় । তারপর সবাই দল বেঁধে সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করে। মাস সুইসাইড।’

‘বলেন কী।’

‘নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে মাস সুইসাইডের ব্যাপারটা আছে। সীলমাছ করে, নীল তিমিরা করে, হাতি করে। আবার এককভাবে আত্মহত্যার ব্যাপারও আছে। একক আত্মহত্যার ব্যাপারটা দেখা যায় প্রধানত কুকুরের মধ্যে। প্রভূর মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে এরা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে আত্মহত্যা করে । পশুদের আত্মহত্যার ব্যাপারটা জানতে চাচ্ছ কেন?’

জানতে চাচ্ছি, কারণ, আপনার কন্যার ধারণা আপনি পৃথিবীর সব প্রশ্নের জবাব জানেন । সত্যি জানেন কি না পরীক্ষা করলাম ।

আসাদুল্লাহ সাহেব আবারও হাসছেন। আমার আবারও মনে হলো, মানুষ এত সুন্দর করে হাসে কীভাবে?

‘মারিয়ার এরকম ধারণা অবিশ্যি আছে, যদিও তার মা’র ধারণা, আমি পৃথিবীর কোনো প্রশ্নেরই জবাব জানি না। ভালো কথা, হিমালয় নামটা ডাকার জন্যে একটু বড় হয়ে গেছে- হিমু ডাকলে কি রাগ করবে?”

‘জি না ।”

'হিমু সাহেব!'

''জি।'

'ব্যাপারটা কী তোমাকে বলি- আমার হলো জাহাজের নাবিকের চাকরি । সিঙ্গাপুরের গোল্ডেন হেড শিপিং করপোরেশনের সঙ্গে আছি। মাসের পর মাস থাকতে হয় সমুদ্রে। প্রচুর অবসর। আমার কাছে বই পড়ার নেশা- ক্রমাগত পড়ি। স্মৃতিশক্তি ভালো, যা পড়ি মনে থাকে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে চট করে জবাব দিতে পারি।'

'এনসাইক্লোপিডিয়া হিউমেনিকা?'

'হা হা হা। তুমি তো মজা করে কথা বল। মোটেই এনসাইক্লোপিডিয়া না। আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যে নসাইক্লোপিডিয়া প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দুবার পড়েছে। এনসাইক্লোপিডিয়া মানুষ কেনে সাজিয়ে রাখার জন্যে, পড়ার জন্যে না । আমার হাতে ছিল প্রচুর সময়- সময়টা লাগিয়েছি। পড়েছি।'

'পড়তে আপনার ভালো লাগে?'

'শুধু ভালো লাগে না, অসাধারণ ভালো লাগে। প্রায়ই কী ভাবি জান? প্রায়ই ভাবি, মৃত্যুর পর আমাকে যদি বেহেশতে পাঠানো হয় তখন কী হবে? সেখানে কি লাইব্রেরি আছে? নানান ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটে দেখেছি। স্বর্গে লাইব্রেরি আছে এরকম কথা কোনো ধর্মগ্রন্থে পাইনি। সুন্দরী হরদের কথা আছে, খাদ্য-পানীয়ের কথা আছে, ফলমূলের কথা আছে, বাট নো লাইব্রেরি।'

'বেহেশতে আপনি নিজের ভুবন নিজের মতে করে সাজিয়ে নিতে পারবেন। আপনার ইচ্ছানুসারে আপনার হাতের কাছেই থাকবে আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরির মতো প্রকাণ্ড লাইব্রেরি।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, নিজের বেহেশত নিজের মতো করা গেলে আমার বেহেশত কীরকম হবে তোমাকে বলি– সুন্দর একটা বিছানা থাকবে, বিছানায়

বেশ কয়েকটা বালিশ। চারপাশে আলমিরা ভরতি বই, একদম হাতের কাছে, যেন বিছানা থেকে না নেমেই বই নিতে পারি। কলিংবেল থাকবে- বেল টিপলেই চা আসবে |'

'গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে না? 'ভাল কথা মনে করেছ! অবশ্যই গান শোনার ব্যবস্থা থাকবে। সফট ষ্টেরিও

মিউজিক সারাক্ষণ হবে । মিউজিক পছন্দ না হলে আপনা-আপনি অন্য মিউজিক বাজা শুরু হবে । হাত দিয়ে বোতাম টিপে ক্যাসেট বদলাতে হবে না।'

'সারাক্ষণ ঘরে বন্দি থাকতে ভালো লাগবে?'

'বন্দি বলছ কেন? বই খোলা মানে নতুন একটা জগৎ খুলে দেয়া।'

'তার পরেও আপনার হয়তো আকাশ দেখতে ইচ্ছা করবে।'

'এটাও মন্দ বলনি। হ্যা থাকবে, বিশাল এটা জানালা আমার ঘরে থাকবে। তবে জানালায় মোটা পর্দা দেয়া থাকবে। যখন আকাশ দেখতে ইচ্ছে করবে- পর্দা সরিয়ে দেব |'

'এই হবে আপনার বেহেশত?'

'হ্যাঁ, এই।" 'আপনার স্ত্রী আপনার কন্যা এরা আপনার পাশে থাকবে না?'

'থাকলে ভালো। না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই।'

'ভালো করে ভেবে দেখুন, আপনার বেহেশতে কিছু বাদ পড়ে যায়নি তো?'

'না, সব আছে।'

'খুব প্রিয় কিছু হয়তো বাদ পড়ে গেল।'

আসাদুল্লাহ সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এমনভাবে কথা বলছ যেন এক্ষুনি বেহেশতটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে ।

আমি হাসলাম। আসাদুল্লাহ সাহেব ভুরু কুঁচকে বললেন, ও, একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। ভালো একটা আয়না লাগবে। একসঙ্গে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখা যায় এরকম

একটা আয়না । আমার একটা মেয়েলি স্বভাব আছে । আয়নায় নিজেকে দেখতে আমার ভাল লাগে ।

'সবারই আয়নায় নিজেকে দেখতে ভালো লাগে।'

আসাদুল্লাহ সাহেব চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, তুমি কি জান আয়নায় মানুষ যেছবিটা দেখে সেটা আসলে ভুল ছবি- উলটো ছবি? আয়নার ছবিটাকে বলে মিরর ইমেজ। আয়নায় নিজেকে দেখা যায় না- উলটো মানুষ দেখা যায়।

'এমন একটা আয়না কি বানানো যায় না যেখানে মানুষ যেমন- তেমনই দেখা যাবে?'

'সেই চেষ্টা কেউ করেনি।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, ভুরু কুঁচকে ফেললেন। আমি বললাম, এত চিন্তিত হয়ে কী ভাবছেন?

'ভাবছি, বেহেশতের পরিকল্পনায় কিছু বাদ পড়ে গেল কি না।'

আসাদুল্লাহ সাহেব মৃত্যুর আগেই তাঁর বেহেশত পেয়ে গেছেন। তাঁর চারটা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও এক মে মাসে ঢাকা শহরে রিকশা নিয়ে বের হলেন । গাড়িতে চড়লে আকাশ দেখা যায় না। রিকশায় চড়লে আকাশ দেখতে দেখতে যাওয়া যায় বলেই রিকশা নেয়া । আকাশ দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন, একটা টেম্পো এসে রিকশাকে ধাক্কা

দিল। এমনকিছু ভয়াবহ ধাক্কা না, তার পরেও তিনি রিকশা থেকে পড়ে গেলেন–মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে গেল। পেরোপ্লাজিয়া হয়ে গেল । সুষুম্নাকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হলো। তার বাকি জীবনটা কাটবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে । ডাক্তাররা সেরকমই বলেছেন ।

আমি তাঁকে একদিন দেখতে গেলাম ! যে-ঘরে তিনি আছেন তার ঠিক মাঝখানে বড় একটা বিছানা। বিছানায় পাঁচ-ছটা বালিশ। তিন পাশে আলমিরাভরতি বই। হাতের কাছে ষ্টেরিও সিস্টেম । বিছানার মাথার কাছে বড় জানালা। জানালায় ভিনিসিয়ান ব্লাইন্ড। সবই আছে, শুধু কোনো আয়না চোখে পড়ল না।

আমাকে দেখেই আসাদুল্লাহ সাহেব হাসিমুখে বললেন, খবর কী হিমু সাহেব?

আমি বললাম, জি ভালো ।

'তোমার কাজ তো শুনি রাস্তায় হাঁটাহাটি করা– হাঁটাহাটি ঠিকমতো হচ্ছে?'

'হচ্ছে ।'

'কী খাবে বলো, চা না কফি? একবার বেল টিপলে চা আসবে। দুবার টিপলে কফি । খুব ভালো ব্যবস্থা।'

'কফি খাব।'

আসাদুল্লাহ সাহেব দুবার বেল টিপলেন। আবারও হাসলেন। তাঁর হাসি আগের মতেই সুদর প্রকৃতি তাঁকে বিছানায় ফেলে দিয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্য হরণ করেনি। সেদিন বরং হাসিটা আরও বেশি সুন্দর লাগল।

'হিমু সাহেব!'

'জি।'

'জীবিত অবস্থাতেই আমি আমার কল্পনার বেহেশত পেয়ে গেছি। আমার কি উচিত না গড় অলমাইটির প্রতি অভিভূত হওয়া?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। কবিতা শুনবে?'

'আপনি শোনাতে চাইলে শুনব ।'

'আগে কবিতা ভালো লাগত না । ইদানিং লাগছে- শোনো...'

আসাদুল্লাহ সাহেব কবিতা আবৃত্তি করলেন। ভদ্রলোকের সবকিছুই আগের মতো আছে। শুধু গলার স্বরে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। মনে হয় অনেক দূর থেকে কথা বলছেন

"এখন বাতাস নেই– তবু

শুধু বাতাসের শব্দ হয়

বাতাসের মত সময়ের ।

কোনো রৌদ্র নেই, তবু আছে।

কোনো পাখি নেই, তবু রৌদ্রে সারা দিন

হংসের আলোর কণ্ঠ রয়ে গেছে।”

‘বলো দেখি কার কবিতা?’

‘বলতে পারছি না, আমি কবিতা পড়ি না।’

‘কবিতা পড় না?’

‘জি না। আমি কিছুই পড়ি না। দু’একটা জটিল কবিতা মুখস্থ করে রাখি মানুষকে ভড়কে দেবার জন্যে। আমার কবিতাপ্রতি বলতে এইটুকুই।’

কফি চলে এসেছে। গন্ধ থেকেই বোঝা যাচ্ছে খুব ভালো কফি । আমি কফি খাচ্ছি। আসাদুল্লাহ সাহেব উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। তার হাতে কফির কাপ । তিনি কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন না। তাকিয়ে আছেন জানালার দিকে । সেই জানালায় ভারি পর্দা । আকাশ দেখার উপায় নেই। আসাদুল্লাহ সাহেবের এখন হয়তো আকাশ দেখতে ইচ্ছা করে না।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০৮

‘কেমন আছেন আসগর সাহেব?’

‘জি ভালো ।’

‘কীরকম ভালো?’

আসগর সাহেব হাসলেন। তার হাঁসি দেখে মনে হলো না তিনি ভালো। মৃত্যুর ছায়া যাদের চোখে পড়ে তারা এক বিশেষ ধরনের হাসি হাসে । উনি সেই হাসি হাসছেন।

আমি একবার ময়মনসিংহ সেন্ট্রাল জেলে এক ফাঁসির আসামি দেখতে গিয়েছিলাম । ফাঁসির আসামি কীভাবে হাসে সেটা আমার দেখার প্রাপ্ত। ফাঁসির আসামির নাম হোসেন মোল্লা- তাকে খুব স্বাভাবিক মনে হলো। শুধু রাগীর মতো জ্বলজ্বলে চোখ। সেই চোখও অস্থির, একবার এদিকে যাচ্ছে, একার ওদিকে। বেচারার ফাঁসির দিন-তারিখ জেলার সাহেব ঠিক করতে পারছেন না। কারণ, বাংলাদেশে নাকি দুই ভাই আছে যারা বিভিন্ন জেলখানায় ফাঁসি দিয়ে – তারা ডেট দিতে পারছে না। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যক্রমে আমি যেদিন গিয়েছি সেদিনই দুই ভাই চলে এসেছে। পরদিন ভোরে হোসেন মোল্লার সময় ধার্য হয়েছে। হোসেন মোল্লা আমাকে শান্ত গলায় বলল, “ভাইসাহেব, এখনও হাতে মেলা সময় । এই ধরেন, আইজ সারা দিন পইরা আছে, তার পরে আছে গোটা একটা রাইত । ঘটনা ঘটনের এখনও মেলা দেরি।” বলেই হোসেন হাসল। সেই হাসি দেখে আমার সারা গায়ে কাটা দিল । প্রেতের হাসি ।

আসগর সাহেবের হাসি দেখেও গায়ে কাঁটা দিল । কী ভয়ংকর হাসি। আমি বললাম, ভাই, আপনার কী হয়েছে? ডাক্তার বলছে কী?

‘আলসার । সারাজীবন অনিয়ম করেছি— খাওয়াদাওয়া সময়মতো হয় নাই, সেখান থেকে আলসার |’

‘পেটে রোলারের গুতাও তো খেয়েছিলেন ।’

‘রোলারের গুতা না খেলেও যা হবার হতো। সব কপালের লিখন, তাই না হিমু ভাই?’

‘তা তো বটেই।’

‘দূরে বসে চিকন কলমে একজন কপালভরতি লেখা লেখেন। সেই লেখার উপরে জীবন চলে ।’

‘হুঁ। মাঝে মাঝে ওনার কলমের কালি শেষ হয়ে যায়, তখন কিছু লেখেন না। মুখে বলে দেন– “যা ব্যাটা, নিজের মতো চরে খা”- এই বলে নতুন কলম নিয়ে অন্য একজনের কপালে লিখতে বসেন।’

‘বড়ই রহস্য এই দুনিয়া!’

”রহস্য তো বটেই— এখন বলুন আপনার চিকিৎসার কী হচ্ছে?’

‘অপারেশন হবার কথা ।’

‘হবার কথা, হচ্ছে না কেন?’

‘দেশে এখন সমস্যা । ডাক্তাররা ঠিকমতো আসতে পারেন না। অল্প সময়ের জন্যে অপারেশন থিয়েটার খোলে । আমার চেয়েও যারা সিরিয়াস তাদের অপারেশন হয় ।’

‘ও আচ্ছা |’

‘মৃত্যু নিয়ে আমার কোনো ভয়ভীতি নাই হিমু ভাই।’

আমি আবারও বললাম, ও আচ্ছা।

‘ভালোমতো মরতে পারাও একটা আনন্দের ব্যাপার।’

‘আপনি শিগগিরই মারা যাচ্ছেন?’

‘জি ।’

‘মরে গেলে সাত হাজার টাকাটার কি হবে? ঐ লোক যে-কোনোদিন চলে আসতে পারে ।’

‘ও আসবে না ।’

‘বুঝলেন কী করে আসবে না?

‘তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।’

‘তার সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে মানে? সে কি হাসপাতালে এসেছিল?’

‘জি ।’

‘আসগর ভাই, ব্যাপারটা ভালোমতো বুঝিয়ে বলুন তো । আমি ঠিকমতো বুঝতে পারছি না ।’

আসগর সাহেব মৃদু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। বোঝা যাচ্ছে যা বলছেন–খুব আগ্রহ নিয়ে বলছেন।

‘বুঝলেন হিমু ভাই- প্রচণ্ড ব্যথার জন্য রাতে ঘুমাতে পারি না। গত রাতে ডাক্তার সাহেব একটা ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। রাত তিনটার দিকে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি খুব পানির পিপাসা। হাতের কাছ টেবিলের উপর একটা পানির জগ আছে। জগে পানি নাই । জেগে আছি- নার্সদের কেউ এদিকে আসলে পানির কথা বলব- কেউ আসছে না। হঠাৎ কে যেন দুবার কাশল । আমার টেবিল উত্তর দিকে— কাশিটা আসল দক্ষিণ দিক থেকে। মাথা ঘুরিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম। দেখি- মনসুর ‘

‘মনসুর কে?’

‘যে আমাকে সাত হাজার এক টাকা দিয়ে গিয়েছিল- সে ।’

‘ও আচ্ছা ।’

‘আমি গেলাম রেগে । এই লোকটা আমাকে কী যন্ত্রণায় ফেলেছে ভেবে দেখুন দেখি! আমি বললাম, তোমার ব্যাপারটা কী? কোথায় ছিলে তুমি? তুমি কি জান তুমি আমাকে কী যন্ত্রণায় ফেলেছ? মনসুর চুপ করে রইল। মাথাও তোলে না। আমি বললাম, কথা বল না কেন? শেষে সে বলল, ভাইজান, আমি আসব ক্যামনে? আমার মৃত্যু হয়েছে। আপনে

যেমন মনঃকষ্টে আছেন আমিও মনঃকষ্টে আছি। এত কষ্টের টাকা পরিবাররে পাঠাইতে পারি নাই ।

আমি বললাম, তুমি ঠিকানা বলো আমি পাঠিয়ে দিব। টাকার পরিমাণ আরও বেড়েছে। পোস্টাপিসের পাসবইয়ে টাকা রেখে দিয়েছিলাম। বেড়ে ডবলের বেশি হবার কথা। আমি খোজ নেই নাই। তুমি ঠিকানাটা বলো ।

মনসুর আবার মাথা নিচু করে ফেলল। আমি বললাম, কথা বলো। চুপ করে আছ কেন? মনসুর বলল, ঠিকানা মনে নাই স্যার। পরিবারের নামও মনে নাই – বলেই কান্না শুরু করল। তখন একজন নার্স ঢুকল— তাকিয়ে দেখি মনসুর নাই। আমি নার্সকে বললাম, সিস্টার, পানি খাব । তিনি আমাকে পানি খাইয়ে চলে গেলেন। আমি সারারাত জেগে থাকলাম মনসুরের জন্যে। তার আর দেখা পেলাম না। এই হচ্ছে হিমু ভাই ঘটনা ।'

'এটা কোনো ঘটনা না- এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখেছেন।'

'জি না ভাইসাহেব, স্বপ্নে না। স্পষ্ট চোখের সামনে দেখা। মনসুর আগের মতেই আছে, তার কোনো পরিবর্তন হয় নাই।'

'আসগর ভাই, মনসুর মরে ভূত হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছে? আপনার কথা ভুলে গেছে- অথচ পরিবারের নাম-ঠিকানা ভুলে গেছে– এটা কি হয়? হয় না। এই ধরনের ঘটনা স্বপ্নে ঘটে। আপনাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে- আপনি তার মধ্যে স্বপ্নের মতো দেখেছেন।'

'স্বপ্ন না হিমু ভাই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যান, স্বপ্ন না।'

'আমার মৃত্যুর পর আপনাকে কয়েকটা কাজ করতে হবে হিমু ভাই।'

'যা বলবেন করব ।'

'কাজগুলি কী, বলব?'

'আপনি নিশ্চয়ই দুএকদিনের মধ্যে মারা যাচ্ছেন না। কিছু সময় তো হাতে আছে!'

'কী করে বলব ভাইসাহেব— হায়াত-মউত তো আমাদের হাতে না ।'

'কিন্তু আপনি যেভাবে বলছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মৃত্যু আপনার নিজের হাতে । শুনুন আসগর সাহেব, আপনাকে এখন মরলে চলবে না- আমাকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে। আপনার মুক্তার মতো হাতের লেখায় আপনি আমার হয়ে একটা চিঠি লিখবেন।'

'কাকে লিখব?'

'একটা মেয়েকে লিখবেন । তার নাম মারিয়া। খুব দামি কাগজে খুব সুন্দর কালিতে চিঠিটা লিখতে হবে।'

'অবশ্যই লিখব হিমু ভাই। আনন্দের সঙ্গে লিখব।'

'সমস্যা হলো কী জানেন? অসহযোগের জন্যে দোকানপাট সব বন্ধ । দামি কাগজ যে কিনব সেই উপায় নেই। কাজেই অসহযোগ না কাটা পর্যন্ত যেভাবেই হোক আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে- এটা মনে রাখবেন । আমাকে যদি চিঠিটা লিখে না দিয়ে যান তা হলে আমার একটা আফসোস থাকবে ।'

'আপনার চিঠি আমি অবশ্যই লিখে দেব হিমু ভাই।'

'তা-হলে আজ উঠি ।'

'আরেকটু বসেন।'

'অসুস্থ মানুষের পাশে বসে থাকতে ভালো লাগে না।'

আসগর সাহেব নিচু গলায় বললেন, আমার শরীরটা অসুস্থ, কিন্তু হিমু ভাই মনটা সুস্থ । আমার মনে কোনো রোগ নাই।

আমি চমকে তাকালাম। মৃত্যুর-লক্ষণ বলে একটা ব্যাপার আছে। মৃত্যুর আগেআগে এইসব লক্ষণ প্রকাশ পায়। মানুষ হঠাৎ করে উচ্চস্তরের দার্শনিক কথাবার্তা বলতে শুরু করে ।

তাদের চোখের জ্যেতি নিভে যায়। চোখে কোনো প্রাণ থাকে না। শরীরের যে-অংশ সবার আগে মারা যায়- তার নাম চোখ ।

‘হিমু ভাই!’

‘জি?’

‘ডাক-চলাচল কি আছে?’

কিছুই চলছে না— ডাক চলবে কিভাবে?’

‘আমার আত্মীয়স্বজনদের একটু খবর দেয়া দরকার। ওদের দেখার জন্য যে মনটা ব্যস্ত তা না- অসুস্থ ছিলাম এই তারা না পেলে মনে কষ্ট পাবে।’

‘ডাক-চলাচল শুরু হলেই খবর দিয়ে দেব।’

‘মানুষ খুব কষ্ট করছে, তাই না হিমু ভাই?’

‘বড় বড় নেতারা যদি ভুল করেন তা-হলে সাধারণ মানুষ তো কষ্ট করবেই!’

”আমরা যারা ছোট মানুষ আছি হিমু ভাই- আমরাও ভুল করি। মানুষের জন্যই হয়েছে ভুল করার জন্য। তবে হিমু ভাই, ছোট মানুষের ভুল ছোট ছোট। তাতে তার নিজের ক্ষতি, আর কারোর ক্ষতি হয় না। বড় মানুষের ভুলগুলোও বড় বড়। তাদের ভুলে সবার ক্ষতি হয়। আমরা ছোট মানুষরা নিজেদের মঙ্গল চাই। বড় মানুষরাও তাদের মঙ্গল চান । কিন্তু হিমু ভাই, তারা ভুলে যান, যেহেতু তারা বড় সেহেতু তাদের নিজেদের মঙ্গল দেখলে হবে না। তাদের দেখতে হবে সবার মঙ্গল । ঠিক বলেছি?’

‘ঠিক বলেছেন। আমাকে এইসব ঠিক কথা বলে লাভ কী? যাদের বলা দরকার তাদের বললে তো তারা শুনবেন না ।’

‘একটা কি ব্যবস্থা করা যায় হিমু ভাই- আমি বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দুটা কথা বলব, শেখ হাসিনার সঙ্গে দুটা কথা বলব- এরশাদ সাহেবের সঙ্গে তো কথা বলা যাবে না । উনি জেলে।’

‘কারও সঙ্গেই কথা বলা যাবে না— নেতারা সবাই আসলে জেলে । নিজেদের তৈরি লোকজন। তারা তা জানেন না। তারা মনে করেন তারা স্বাধীন মুক্ত বিহঙ্গ... আসগর সাহেব!’

‘জি হিমু ভাই?’

‘উচ্চস্তরের চিন্তাভাবনা করে কোনো লাভ নেই। আপনি ঘুমাবার চেষ্টা করেন।’

‘জি আচ্ছা। আপনাকে একটা কথা বলব হিমু ভাই, যদি মনে কিছু না করেন।’

‘জি না, মনে কিছু করব না।’

‘আপনি যে-চিঠিটা আমাকে দিয়ে লেখাবেন সেই চিঠির কাগজটা আমি কিনব।’

‘সেটা হলে তো খুবই ভালো হয়। আমার হাত একেবারে খালি ।’

‘বাংলাদেশের সবচে দামি কাগজটা আমি আপনার জন্যে কিনব হিমু ভাই । শুধু কাগজ কিনলে তো হবে না- কলমও লাগবে, কালিও লাগবে। সবচে দামি কাগজে দুটাকা দামের বল পয়েন্টে লিখবেন তা তো হয় না। দামি কাগজে লেখার জন্যে লাগে দামি কলম।’

‘খুবই খাটি কথা বলেছেন হিমু ভাই- কলম আর কালিও আমি কিনব। আমি যে আপনাকে কী পছন্দ করি আপনি জানেন না হিমু ভাই।’

‘জানব না কেন, জানি। ভালোবাসা মুখ ফুটে বলতে হয় না। ভালোবাসা টের পাওয়া যায়। আজ যাই আসগর সাহেব! দেশ স্বাভাবিক হোক। দোকানপাট খুলুক–আপনাকে সঙ্গে নিয়ে কাগজ-কলম কিনে আনব |’

“অবশ্যই। অবশ্যই ।’

‘আর ইতোমধ্যে যদি এসে আপনাকে বিরক্ত করে তা হলে কষে ধমক লাগবেন। মানুষ হয়ে ভূতদের হাংকিপাংকি সহ্য করা কোনো কাজের কথা না।’

আজ হরতালের কত দিন চলছে? মনে হচ্ছে সবাই দিন-তারিখের হিসেব রাখা ভুলে গেছে। নগরীর জন্ডিস হয়েছে। নগরী পড়ে আছে ঝিম মেরে। এই রোগের চিকিৎসা নেই– বিশ্রামই একমাত্র চিকিৎসা । নগরী বিশ্রাম নিচ্ছে। আগের হরতালগুলিতে মোটামুটি আনন্দ ছিল । লোকজন ভিডিও ক্যাসেটের দোকান থেকে ক্যাসেট নিয়ে যেত। স্বামীরা দুপুরে স্ত্রীদের সঙ্গে ঘুমানোর সুযোগ পেত। স্ত্রীরা আঁতকে উঠে বলত- এ কী! দিনে-দুপুরে দরজা লাগাচ্ছ কেন? বাড়িভরতি ছেলেমেয়ে। স্বামী উদাস গলায় বলত, আজ হরতাল না?

এখনকার অবস্থা সেরকম না, এখন অন্যরকম পরিবেশ। জন্ডিসে আক্রান্ত নগরী রোগ সামলে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠতে পারবে তো— এটাই সবার জিজ্ঞাসা । নাকি নগরীর মৃত্যু হবে? মানুষের মতো নগরীরও মৃত্যু হয়।

আমি হাঁটছি। আমার পাশে পাশে হাঁটছে বাদল । আমি বললাম— দীর্ঘ হরতালের কিছু-কিছু উপকারিতা আছে। বল তো কী কী?

‘রোড অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে না ।”

‘গুড– হয়েছে। আর কী?’

‘পলিউশন কমেছে- গাড়ির ধোয়া, কার্বন মনক্সাইড কিছু নেই।’

‘ভেরি গুড ।’

‘লোকজন বেশি হাঁটাহাঁটি করছে, তাদের স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে। ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা কমছে।’

‘হয়েছে- আর কী?’

‘আরবদের কাছ থেকে আমাদের পেট্রোল কিনতে হচ্ছে না। কিছু ফরেন কারেন্সি বেঁচে যাচ্ছে ।’

‘হুঁ।’

আমরা পরিবারের সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে পারছি। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হচ্ছে।

'হুঁ।'

'পলিটিক্স নিয়ে সবাই আলোচনা করছি- আমাদের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে । দেশ নিয়ে সবাই ভাবছি।'

'আর কিছু আছে?'

'আর তো কিছু মনে পড়ছে না।'

আরও অনেক আছে। ভেবে ভেবে সব পয়েন্ট বের কর, তারপর একটা লিফলেট ছাড়ব।'

'তাতে লাভ কী?'

'আছে, লাভ আছে।'

'তোমার ভাবভঙ্গি আমি কিছুই বুঝি না। তুমি কোন দলের লোক বলো তো! আওয়ামী লীগ, না বিএনপি?

'আওয়ামী লীগ যখন খারাপ কিছু করে তখন আমি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করি। আর বিএনপি যখন খারাপ কিছু করে তখন বিএনপির সমর্থক।'

'এর মানে কী?

'ভালো কাজের সমর্থন সবসময়ই থাকে। খারাপ কাজগুলির সমর্থনের লোক পাওয়া যায় না। আমি সেই লোক । খারাপ কাজের জন্যেও সমর্থন লাগে । কারণ সব খারাপের মধ্যেও কিছু মঙ্গল থাকে।'

'আমরা যাচ্ছি কোথায় হিমুদা?'

'একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।"

'কে? মারিয়া?'

'উহুঁ, তার নাম জয়গুন ।'

'জয়গুন কে?'

'তুই চিনবি না- খারাপ ধরনের মেয়ে।'

'ও আচ্ছা |'

বাদল চমকাল না বা বিক্ষিত হলো না । সে আমার আদর্শ ভক্ত । দলপতির কোনো সিদ্ধান্তের বিষয়ে কিছু বলবে না। বিস্মিত হবে না, চমকাবে না। অন্ধের মতো অনুসরণ করবে। একদল মানুষ কি শুধু অনুসরণ করার জন্যেই জন্মায়?

প্রথম তিনটা টোকা, তারপর একটা, তারপর আবার তিনটা । এরকম করতে থাকলে জয়গুন নামের অতি রূপবতী এক তরুণীর এসে দরজা খুলে দেবার কথা। যার শাড়ি থাকবে এলোমেলো। যার ব্লাউজের দুটা বোতাম নেই- ।

বেশ কয়েকবার মোর্স কোডের ভঙ্গিতে তিন এক তিন এক শব্দ করার পর দরজা সামান্য খুলল। সামান্য ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে না দরজা কে খুলেছে। কানা কুদ্দুস বলে দিয়েছিল, দরজা খুলবে জয়গুন । সেই ভরসাতে আন্দাজের উপর বললাম, কেমন আছ জয়গুন?

ভেতর থেকে তীক্ষ কণ্ঠ ভেসে এল- আপনে কে?

'আমার নাম হিমু।'

দরজা খুলে গেল। আমার সামনে জয়গুন দাঁড়িয়ে আছে। তার শাড়ি মোটেও এলোমেলো নয়। তার ব্লাউজের বোতামও ঠিক আছে। খুব রূপবতী মেয়ে দেখব বলে এসেছিলাম, দুধে আলতা রঙের একজনকে দেখছি— রূপবতী বলার কোনো কারণ নাই। দাঁত উঁচু। যথেষ্ট মোটা। থপথপ করে হাঁটছে। একেক জনের সৌন্দর্য একেক রকম। কুদ্দুসের কাছে জয়গুন হলো- হেলেন অভ ট্রয়। জয়গুন মধুর গলায় বলল, ও আল্লা, ভিতরে আসেন।

'আমি সঙ্গে করে আমার এক ভাইকে নিয়ে এসেছি। ওর নাম বাদল ।'

'অবশ্যই আনবেন। ছোট ভাই আসো।'

জয়গুন হাত ধরে বাদলকে ভেতরে নিয়ে গেল। বাদল সংকুচিত হয়ে রইল। আমি বেশ আগ্রহ নিয়ে জয়গুনের ঘর দেখছি। সাজানো-গোছানো ঘর। রঙিন টিভি আছে। ভিসিআর আছে। এই মুহূর্তে ভিসিআর-এ হিন্দি ছবি চলছে।

জয়গুন লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, সময় কাটে না, এইজন্যে রোজ তিনটা-চাইরটা কইরা ছবি দেখি। আপনেরা আরাম কইরা বসেন। এসি ছাড়ি?

'এসি আছে?'

'জি আছে। ঠাণ্ডা বাতাসে শইল্যে বাত হয়, এইজন্য এসি ছাড়ি না। ফ্যান দিয়া কাম সারি।'

'আমাদের জন্যে এসি ছাড়বে— এতে তোমার আবার বাত হবে না তো?'

'কী যে কন হিমু ভাইজান! অল্প সময়ে আর কী বাত হইব!'

'অল্প সময় তো না- আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। এসেছি যখন ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় ভিসিআর-এ একটা ছবি দেখে যাই । অনেকদিন হিন্দি ছবি দেখা হয় না । তোমার অসুবিধা হবে?'

'কী যে কন ভাইজান আপনে সারাজীবন থাকলেও অসুবিধা নাই ।'

'তুমি একা থাক?'

'হ, একাই থাকি।'

'রান্নাবান্না কে করে?'

'কেউ করে না । হোটেল থাইক্যা খাওন আসে । কাজকামের লোক রাখন আমার পুষায় না। খালি ভ্যানভ্যান করে । আমার হোটেলের সাথে কনটাক ।

'ভালো ব্যবস্থা তো"

'"কপি" খাইবেন?– কপি বানানির জিনিস আছে।'

'হ্যা, "কপি" খাওয়া যায়।'

জয়গুন অতি ব্যস্ততার সঙ্গে "কপি" আনতে গেল । আমি জয়গুনের বিছানায় পা বোস। একটা হিন্দি ছবি দেখি । দুদিন পর গায়ে কেরোসিন ঢেলে মরে যাবি– হিন্দি ছবি দেখে মনটা ঠিকঠাক কর ।

'তুমি কি সত্যিসত্যি ছবি দেখবে?'

'অবশ্যই।'

'আমি চিনি না— কানা কুদ্দুস চেনে।'

'কানা কুদ্দুস কে?'

'ভয়াবহ খুনি। মানুষ মারা তার কাছে কোনো ব্যাপারই না। মশা মারার মতোই সহজ।'

'এই ভদ্রমহিলা ওনার স্ত্রী?'

'প্রায় সেরকমই। জয়গুন কুদ্দুসের বনলতা সেন।'

'ভদ্রমহিলা কী সুন্দর দেখেছ হিমুদা?'

'সুন্দর?'

'আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, যতই দেখছি- ততই অবাক হচ্ছি।'

'তোর মনে হচ্ছে না দাঁতগুলি বেশি উঁচু?'

'তোমার দাঁতের দিকে তাকাবার দরকার কী?'

'তাও তো বটে। দাঁতের দিকে তাকাব কেন? হাতি হলে দাঁতের দিকে তাকানোর একটা ব্যাপার চলে আসত। গজদন্ত বিরাট ব্যাপার। মানবদন্ত তেমন কোনো ব্যাপার না। মানবদন্তের জন্ম হয় ডেনটিস্টের তুলে ফেলার জন্যে।'

'তোমার কথা কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বোঝার দরকার আছে?" 'না, দরকার নেই।'

জয়গুন মগে করে "কপি" নিয়ে এসেছে। এক এক মগে এক এক পোয়া করে চিনি দিয়ে বানানো ঘন এক সিরাপজাতীয় বস্তু। আমি মুখে দিয়ে বললাম অপূর্ব আমি যা করি বাদলও তা-ই করে। কাজেই বাদলও চোখ বড় বড় করে বলল, অপূর্ব!

জয়গুনের সুন্দর মুখ আনন্দে ভরে গেল। সে বলল, ছবি দেখবেন ভাইজান?

'হ্যা দেখব । ভালো একটা-কিছু দাও।'

পুরানো ছবি দেখবেন? দিদার আছে- দিলীপকুমারের ছবি।'

'দিলীপকুমারের ছবি দেখা যেতে পারে।'

'বেলেক এন্ড হোয়াইট।'

'শাদা-কালোর কোনো অসুবিধা নেই- তারপর জয়গুন, কুদ্দুসের কোনো খবর জান?'

'জি না । মেলা দিন কোনো খোঁজ নাই। বুঝছেন ভাইজান, মানুষটার জন্য অত অস্থির থাকি- হে বুঝে না। কোনদিন কোন বিপদে পড়ে! বিপদের কি কোনো মা-বাপ আছে? সবকিছুর মা-বাপ আছে বিপদের মা-বাপ নাই। তারে কে বুঝাইবে কন? আফনেরে খুব মানে। যখন আসে তখনই আফনের কথা কয়। ভাইজান!'

'বলো,'

'আফনে তার জন্যে এটু দোয়া করবেন ভাইজান ।'

'আমার দেয়াতে কেনে লাভ হবে না জয়গুণ। সে ভয়ংকর সব পাপ করে বেড়াচ্ছে। সেই পাপের শাস্তি তো হবেই।'

'মৃত্যুর পরে আল্লাহপাক শাস্তি দিলে দিব। এই দুনিয়ায় শান্তি হইব এইটা কেমন বিচার?'

'এটা হচ্ছে জনতার বিচার । আল্লাহপাক কিছু কিছু শাস্তি জনতাকে দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। মানুষ ভুল করে- জনতা ভুল করে না।'

জয়গুন ছবি চালিয়ে দিয়েছে। তার চোখভরতি পানি। কানা কুদ্দুসের মতো একটি ভয়াবহ পাপীর জন্যে জয়গুনের মতো একটি রূপবতী মেয়ে চোখের পানি ফেলছে— কোনো মানে হয়? হয় নিশ্চয়ই– সেই মানে বোঝার ক্ষমতা আমাদের নেই।

ছবি চলছে। আমি, বাদল এবং জয়গুন ছবি দেখছি। জয়গুন ছবি দেখছে গভীর আনন্দ ও বিস্ময় নিয়ে আশ্চর্য। বাদলও তা-ই করছে।

শামসাদ বেগমের কিন্নরকণ্ঠের গান শুরু হলো- 'বাচপানকে দিন তুলানা দেনা।'

বাদলের চোখে পানি । দুদিন পর গায়ে আগুন লেগে যার মরার কথা সে ছবি দেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে- কোনো মানে হয়?

"বাদল!"

'জি!'

'তোর গায়ে কেরোসিন ঢালার ব্যাপারটা মনে হয় তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা দরকার । আর দেরি করা যায় না।'

'কেন?'

'দেশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে। সব স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে । যা করার তার আগেই করতে হবে।'

'দেশ ঠিক হয়ে যাচ্ছে কে বলল?'

'মাঝে মাঝে আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাই ।'

বাদল কিছু বলল না। আমার কথা সে শুনতে পায়নি। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় এখন দিলীপকুমারের কর্মকাণ্ডে নিবেদিত। আমি বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেয়া যেতে পারে। হিন্দি আমি বুঝি না। ওদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না। বাদল এবং জয়গুনের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে- ছবি দেখার জন্যে হলেও হিন্দি শেখার দরকার ছিল । আমি শুনেছি হিন্দি খুব নাকি মিষ্টি ভাষা। আমার মনে হয় না। লেডিস টয়লেটের হিন্দি হচ্ছে- "দেবীও কী হাগন কুঠি" অর্থাৎ "দেবীদের

হাগাঘর”। যে-ভাষায় মেয়েদের বাথরুমের এত কুৎসিত নাম সেই ভাষা মিষ্টি হবার কোনো কারণ নেই। আমি পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ০৯

অনেকদিন পর বাবাকে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি খুব চিন্তিত মুখে আমার বিছানায় বসে আছেন। গায়ে খন্দরের চাদর । হাত দুটা কোলের উপরে ফেলে রাখা । চোখে চশমা । চশমার মোটা কাচের ভেতর থেকে তার জ্বলজ্বল্লেংচোখ দেখা যাচ্ছে। আমি বাবাকে দেখে ধড়মড় করে উঠে বসলাম ।

বাবা বললেন, কেমন আছিস হিমু?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, খুব ভালো আছি বাবা ।

বাবা নিচু গলায় বললেন, তুই তো সব গণ্ডগোল করে ফেলেছিস । এত শখ ছিল তুই মহাপুরুষ হবি। এত ট্রেনিং দিলাম...

‘টেনিং দিয়ে কী আর মহাপুরুষ বানানো যায় বাবা?’

‘ট্রেনিং দিয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারলে মহাপুরুষ বানানো যাবে না কেন? অবশ্যই যায়। ট্রেনিং ঠিকমতো দিতে পারলে..’

‘তা হলে মনে হয় তোমার ট্রেনিং-এ গণ্ডগোল ছিল।’

‘উহুঁ, ট্রেনিং-এ কোনো গণ্ডগোল নেই। তুই নিয়মকানুন মানছিস না। মহাপুরুষের প্রথম শর্ত হলো- কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর মায়া করবি না। মায়া হবে সর্বজনীন । মায়াটাকে ছড়িয়ে দিবি ।’

‘তা-ই তো করছি!’

‘মোটেই তা করছিস না। তুই জড়িয়ে পড়ছিস । মারিয়াটা কে?’

‘মারিয়া হচ্ছে মরিয়ম |’

‘তুই এই মেয়ের সঙ্গে এমন জড়ালি কেন?’

‘জড়াইনি তো বাবা! আমি ওর সাংকেতিক চিঠির জবাব পর্যন্ত দিইনি। ও চিঠি দেবার পর ওর বাসায় যাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি।’

‘এটাই কি প্রমাণ করে না তুই জড়িয়ে পড়েছিস? মেয়েটার মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিস ।’

‘তুমি কি তার বাসায় যেতে বলছ?’

‘অবশ্যই যাবি।’

‘কিন্তু বাবা, একটা ব্যাপার কী জান? আমার ধারণা, এই যে স্বপ্নটা দেখছি এটা আসলে দেখছি আমার অবচেতন মনের কারণে। আমার অবচেতন মন চাচ্ছে আমি মারিয়ার সঙ্গে দেখা করি। সেই চাওয়াটা প্রবল হয়েছে বলেই সে তোমাকে তৈরি করে স্বপ্নে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। তুমি আমাকে মারিয়ার বাসায় যেতে বলছ। তুমি আমার অবচেতন মনেরই একটা ছায়া। এর বেশি কিছু না ।’

‘তা হতে পারে।’

‘আমার অবচেতন মন যা চাচ্ছে, তা-ই তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে।’

‘হুঁ, যুক্তির কথা।’

‘মহাপুরুষরা কি যুক্তিবাদী হন বাবা?’

‘তাদের ভেতর যুক্তি থাকে, কিন্তু তারা যুক্তি দিয়ে পরিচালিত হন না।’

‘কেন?’

‘কারণ যুক্তি শেষ কথা না। শেষ কথা হচ্ছে চেতনা, Conscience.’

‘চেতনা কি যুক্তির বাইরে?’

‘যুক্তি চেতনার একটা অংশ, কিন্তু খুব ক্ষুদ্রংশ। ভালো কথা, মারিয়া মেয়েটা দেখতে কেমন?’

‘খুব সুন্দর। আমি এত সুন্দর মেয়ে আমার জীবনে দেখিনি।’

‘চুল কি কোকড়ানো, না প্লেইন?’

‘চুল কোঁকড়ানো।’

‘তোর মা’র চুলও ছিল কোঁকড়ানো। সে অবিশ্যি দেখতে শ্যামলা ছিল। যা-ই হোক মারিয়া মেয়েটা লম্বা কেমন?’

‘গজ ফিতা দিয়ে তো মাপিনি, তবে লম্বা আছে।’

মুখের শেপ কেমন? গোল না লম্বাটে?”

‘লম্বাটে ।”

“চোখ কেমন?’

‘চোখ খুব সুন্দর।’

‘চোখ কি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছিস? একটা মানুষের ভেতরটা দেখা যায় চোখের দিকে তাকিয়ে । তুই কি চোখ খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছিস?’

‘হুঁ।’

‘আচ্ছা হিমু শোন- মেয়েটার ডান চোখ কি বা চেখের চেয়ে সামান্য বড়?’

‘হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?’

‘তোর মা’র চোখ এইরকম ছিল । আমি যখন তাকে ব্যাপারটা বললাম— ও তো কেঁদেকেটে অস্থির। আমাকে বলে কি, কাজল দিতে গিয়ে এরকম দেখাচ্ছে। একটা চোখে কাজল বেশি পড়েছে- একটায় কম পড়েছে।’

“মা চোখে কাজল দিত?’

‘হ্যাঁ শ্যামলা মেয়েরা যখন চোখে কাজল দেয় তখন অপূর্ব লাগে।’

‘বাবা!’

‘হুঁ?’

‘এই যে মারিয়া সম্পর্কে তুমি জানতে চাচ্ছ, কেন?’

‘তোর মা’র সঙ্গে মেয়েটার মিল আছে কিনা তা জানার জন্যে ।’

‘বাবা শোনো, তুমি এতসব জানতে চাচ্ছ, কারণ মেয়েটার বিষয়ে আমার নিজের কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করছে। আমার অবচেতন মন সেই ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে তোমাকে নিয়ে এসেছে।’

‘হতে পারে।’

‘হতে পারে না। এটাই হলো ঘটনা। তুমি আমার নিজের তৈরি স্বপ্ন ছাড়া কিছু না।’

‘পুরো জগৎটাই তো স্বপ্ন রে বোকা!’

‘তুমি সেই স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্ন। আমি েখন আর স্বপ্ন দেখতে চাচ্ছি না। আবাম করে ঘুমাতে চাচ্ছি।’

‘চলে যেতে বলছিস?’

‘হ্যাঁ, চলে যাও।’

‘তুই ঘুমা, আমি পাশে বসে থাকি।’

‘কোনো দরকার নেই বাবা । তুমি বিদেয় হও ।’

বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বিষন্ন মুখে চলে গেলেন। তার পরপরই আমার ঘুম ভাঙল। মনটা একটু খারাপই হলো । বাবা আরও কিছুক্ষণ বিছানায় বসে থাকলে তেমন কোনো ক্ষতি হতো না ।

আমার বাবা তার পুত্রের জন্যে কিছু উপদেশবাণী রেখে গিয়েছিলেন। ব্রাউন প্যাকেটে মোড়া সেইসব উপদেশবাণীর উপর লেখা আছে কত বয়সে পড়তে হবে। আঠারো বছর হবার পর যে-উপদেশবাণী পড়তে বলেছিলেন—তা হলো!

হিমালয়

তুমি অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছ । আমার অভিনন্দন। অষ্টাদশ বর্ষকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। এই বয়সে নারী ও পুরুষ যৌবনপ্রাপ্ত হয় । তাহাদের চিন্তা-চেতনায় ব্যাপক পরিবর্তন হয় । এই পরিবর্তনের ফল শুভ যেমন হয়—মাঝে মাঝে অশুভও হয় । প্রিয় পুত্র, তোমাকে আজ আমি তরুণ-তরুণীর আকর্ষনের বিষয়ে আমার দীর্ঘদিনের চিন্তার ফসল বলিতে চাই। মন দিয়া পাঠ করো।

তরুণ-তরুণীর আকর্ষণের সমগ্র বিষয়টাই পুরাপুরি জৈবিক। ইহা পশুধর্ম। এই আকর্ষণের ব্যাপারটিকে আমরা নানানভাবে মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রেম নিয়া কবি, সাহিত্যিকরা মাতামাতি করিয়াছেন। চিত্রকররা প্রেমিক-প্রেমিকার ছবি অঙ্কন করিয়াছেন । গীতিকাররা গান রচনা করিয়াছেন । গায়করা সেই গান নানান ভঙ্গিমায় গাহিয়াছেন।

প্রিয় পুত্র, প্রেম বলিয়া জগতে কিছু নাই। ইহা শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ। এই আকর্ষণ প্রকৃতি তৈরি করিয়াছেন যাহাতে তাহার সৃষ্টি বজায় থাকে। নরনারীর মিলনে শিশু জন্মগ্রহণ করিবে- প্রকৃতির সৃষ্টি বজায় থাকিবে ।

একই আকর্ষণ প্রকৃতি তাঁহার সমস্ত জীবজগতে তৈরি করিয়াছেন। আশ্বিন মাসে কুকুরীর শরীর দুই দিনের জন্য উত্তপ্ত হয়। সে তখন কুকুরের সঙ্গের জন্য প্রায় উন্মত্ত আচরণ করে । ইহাকে কি আমরা প্রেম বলিব?

প্রিয় পুত্র, মানুষ ভান করিতে জানে, পশু জানে না- এই একুটি বিষয় ছাড়া মানুষের সঙ্গে পশুর কোনো তফাত নাই। যদি কখনো কোনো তরুণীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ কর, তখন অবশ্যই তুমি সেই আকর্ষণের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবে । দেখিবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু তুচ্ছ শরীর। যেহেতু শরীর নশ্বর সেহেতু নশ্বর ।

প্রিয় পুত্র, তোমাকে ত হইবে । ইহা স্মরণ রাখিয়া অগ্রসর হইও। প্রকৃতি তোমারস্হায় হউক- এই শুভ কামনা।

আমার বাবা কি আসলেই অপ্রকৃতিস্থ? কাদের আমরা প্রকৃতিস্থ বলব? যাদের চিন্তাভাবনা স্বাভাবিক পথে চলে তাদের? যারা একটু অন্যভাবে চিন্তা করে তাদের আমরা আলাদা করে ফেলি- তা কি ঠিক? আমার বাবা তার পুত্রকে মহাপুরুষ বানাতে চেয়েছিলেন। তার ইচ্ছার কথা শোনামাত্রই আমরা তাকে উন্মাদ হিসেবে আলাদা করে ফেলেছি। কোনো বাবা যদি বলেন, আমি আমার ছেলেকে বড় ডাক্তার বানাব তখন আমরা হাসি না, কারণ তিনি চেনা পথে হাটছেন । আমার বাবা তার সমগ্র জীবনে হেঁটেছেন অচেনা পথে । আমি সেই পথ কখনো অস্বীকার করিনি ।

স্বপ্ন আমাকে কাবু করে ফেলেছে। সকালবেলাতেই বিষণ্ন বোধ করছি। বিষন্নতা কাটানোর জন্যে কী করা যায়? মন আরও বিষন্ন হয় এমন কিছু করা? যেমন রূপার সঙ্গে কথা বলা । অনেকদিন তার সঙ্গে কথা হয় না ।

মন এখন বিষন্ন, রূপার সঙ্গে কথা বলার পর মন নতুন করে বিষন্ন হবে । পুরানো বিষগ্রতা এবং নতুন বিষণ্নতায় কাটাকাটি হয়ে আমি স্বাভাবিক হবো। তারপর যাব আসগর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে । তারপর কী? চিত্রলেখা নামের ঐ বাড়িতে কি যাব? দেখে আসব মারিয়াকে?

অনেকবার টেলিফোন করলাম রূপাদের বাসায় । টেলিফোন যাচ্ছে, রূপাই টেলিফোন ধরছে, কিন্তু সে হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে লাইন কেটে যাচ্ছে। প্রকৃতি চাচ্ছে না আমি রূপার সঙ্গে কথা বলি ।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ১০

ফুপার বাড়িতে আজ উৎসব। বাদল তার কেরোসিন টিন ব্যবহার করতে পারেনি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাশ হয়েছে। খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেছেন। দুই দলের মর্যাদা বহাল আছে। দু'দলই দাবি করছে তারা জিতেছে। দু'দলই বিজয়-মিছিল বের করেছে। সব খেলায় একজন জয়ী হন, অন্যজন পরাজিত হন। রাজনীতির খেলাতেই শুধুমাত্র দুটি দল একসঙ্গে জয়ী হতে পারে অথবা একসঙ্গে পরাজিত হয়। রাজনীতির খেলা বড়ই মজাদার খেলা। এই খেলায় অংশগ্রহণ তেমন আনন্দের না, দূর থেকে দেখার আনন্দ আছে।

আমি গভীর আনন্দ নিয়ে খেলাটা দেখছি। শেষের দিকে খেলাটায় উৎসব-ভাব এসে গেছে। ঢাকার মেয়র হানিফ সাহেব করেছেন জনতার মঞ্চ। সেখানে বক্তৃতার সঙ্গে "গানবাজনা" চলছে।

খালেদা জিয়া তৈরি করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চ । সেখানে গানবাজনা একটু কম, কারণ বেশিরভাগ শিল্পীই জনতার মঞ্চে । তাঁরা গানবাজনার অভাব বক্তৃতায় পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। গণতন্ত্র মঞ্চ একটু বেকায়দা অবস্থায় আছে বলে মনে হচ্ছে। তেমন জমছে না। উদ্যোক্তার একটু যেন বিমর্ষ।

দুটি মঞ্চ থেকেই দাবি করা হচ্ছে- আমরা ভারতবিরোধী। ভারতবিরোধিতা আমাদের রাজনীতির একটা চালিকাশক্তি হিসেবে উঠে আসছে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের স্বাধীনতার জন্যে তাদের সাহায্য নিতে হয়েছিল, এই কারণে কি আমরা কোনো হীনম্মন্যতায় ভুগছি?

শুধুমাত্র হীনম্মন্যতায় ভুগলেই এইসব জটিলতা দেখা দেয়। এই হীনম্মন্যতা কাটানোর প্রধান উপায় জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো। সবাই মিলে সেই চেষ্টাটা কি করা যায় না?

আমাদের সারাদেশে অসংখ্য স্মৃতিস্তম্ভ আছে- যেসব ভারতীয় সৈন্য আমাদের স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছেন তাদের জন্যে আমরা কিন্তু কোনো স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করিনি। কেন করিনি? করলে কি জাতি হিসেবে আমরা ছোট হয়ে যাব?

আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা স্বাধীনতা নিয়ে কত চমৎকার সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস লিখলেন- সেখানে কোথাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদানের কোনো উল্লেখ নেই। উল্লেখ করলে ভারতীয় দালাল আখ্যা পাবার আশঙ্কা । বাংলাদেশে এই রিস্ক নেয়া যায় না। অন্য একটি দেশের স্বাধীনতার জন্যে ওঁরা প্রাণ দিয়েছেন । এঁদের ছেলে-মেয়ে-স্ত্রীর কাছে অন্য দেশের স্বাধীনতা কোনো ব্যাপার না । স্বামীহারা স্ত্রী, পিতাহারা সন্তানদের অশ্রুর মুল্য আমরা দেব না? আমরা কি অকৃতজ্ঞ?

বাংলাদেশের আদর্শ নাগরিক কী করবে? ভারতীয় কাপড় পরবে। ভারতীয় বই পড়বে, ভারতীয় ছবি দেখবে, ভারতীয় গান শুনবে। ছেলেমেয়েদের পড়াতে পাঠাবে ভারতীয় স্কুল-কলেজে। চিকিৎসার জন্যে যাবে বোম্বাই, ভ্যালোর- এবং ভারতীয় গরু খেতে খেতে চোখমুখ কুঁচকে বলবে- শালার ইন্ডিয়া! দেশটাকে শেষ করে দিল! দেশটাকে ভারতের খপ্পর থেকে বাঁচাতে হবে।

আমাদের ফুপা মদের গ্লাস হাতে নিয়ে বিজবিজ করে বললেন, বুঝলি হিমু, দেশটাকে ভারতের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এটা হচ্ছে রাইট টাইম ।

আমি বললাম, অবশ্যই!

‘ইন্ডিয়ান দালাল দেশে যে-কটা আছে, সবকটাকে জুতাপেটা করা দরকার।’

আমি বললাম, অবশ্যই!

‘দালালদের নিয়ে মিছিল করতে হবে। সবার গলায় থাকবে জুতার মালা ।’

‘এত জুতা পাবেন কোথায়?’

‘জুতা পাওয়া যাবে। জুতা কোনো সমস্যা না।’

‘অবশ্যই!’

ফুপা অল্প সময়ে যে-পরিমাণ মদ্যপান করেছেন তা তার জন্যে বিপজ্জনক। তাঁর আশেপাশে যারা আছে তাদের জন্যেও বিপজ্জনক। এই অবস্থায় ফুপার প্রতিটি কথায় ‘অবশ্যই’ বলা ছাড়া পায় নেই।

আমরা বসেছি ছাদে। বাদল আগুনে আত্মহুতি দিচ্ছে না এই আনন্দ সেলিব্রেট করা হচ্ছে। ফুপা মদ্যপানের অনুমতি পেয়েছেন। ফুপু কঠিন গলায় বলে দিয়েছেন–শুধু দুই পেগ খাবে। এর বেশি একফোঁটাও না। খবর্দার! হিমু, তোর উপর দায়িত্ব, তুই চোখেচোখে রাখবি । আমি চোখে-চোখে রাখার পরেও– ফুপার এখন সপ্তম পেগ যাচ্ছে। তার কথাবার্তা সবই এলোমেলো। একটু হিক্কার মতোও উঠছে। বমিপর্ব শুরু হতে বেশি দেরি হবে না।

‘হিমু!’

‘জি ফুপা?’

‘দেশটাকে আমাদের ঠিক করতে হবে হিমু।’

‘অবশ্যই!’

‘দেশমাতৃকা অনেক বড় ব্যাপার ।’

‘জি, ঠিকই বলেছেন। দেশপিতৃকা হলে দেশটাকে রসাতলে নিয়ে গেলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।’

‘দেশপিতৃকা আবার কী?’

‘ফাদারল্যান্ডের বাংলা অনুবাদ করলাম ।’

‘ফাদারল্যান্ড কেন বলছিস? জন্মভূমি হলো জননী । জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপী গরিয়সী |’

'ফুপা, আর মদ্যপান করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।'

'খুব ঠিক হচ্ছে। তোর চেখে দেখার ইচ্ছা থাকলে চেখে দ্যাখ। আমি কিছুই মনে করব না। এইসব ব্যাপারে আমি খুবই লিবারল।'

'আমার ইচ্ছা করছে না ফুপা ।'

'ইচ্ছা না করলে থাক। খেতে হয় নিজের রুচিতে, পরতে হয় অন্যের রুচিতে । ঠিক না?'

'অবশ্যই ঠিক ।'

'বুঝলি হিমু, দেশ নিয়ে নতুন করে এখন চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে। ভারতের আগ্রাসন-বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।'

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, জাতীয় পরিষদে আইন পাশ করতে হবে যে, কেউ তাদের ছেলেমেয়দের ভারতে পড়তে পাঠাতে পারবে না, কারণ ভারতীয়রা আমাদের সন্তানদের ব্রেইন ওয়াশ করে দিচ্ছে, তাই না ফুপা?

ফুপা মদের গ্লাস মুখের কাছে নিয়েও নামিয়ে নিলেন। কঠিন কোনো কথা বলতে গিয়েও বললেন না- কারণ তিনি তার পুত্র বাদলকে ভরতি করেছেন দার্জিলিং-এর এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ।

'হিমু!'

'জি ফুপা?'

'রাজনীতি বাদ দিয়ে চল অন্যকিছু নিয়ে আলাপ করি।'

'জি আচ্ছা । কী নিয়ে আলাপ করতে চান? আবহাওয়া নিয়ে কথা বলবেন?'

'না— ।'

'সাহিত্য নিয়ে কথা বলবেন ফুপা? গল্প-উপন্যাস?'

'আরে ধুৎ, সাহিত্য! সাহিত্যের লোকগুলিও বাদ । এরা আরও বেশি বদ।'

'তা হলে কী নিয়ে কথা বলা যায়? একটা কোনো টপিক বের করুন |'

ফুপা মদের গ্রাস হাতে নিয়ে চিন্তিত মুখে টপিক চিন্তা করতে লাগলেন । আমি ছাদে শুয়ে পড়লাম। আকাশে নাকি নতুন কী-একটা ধূমকেতু এসেছে— 'হায়াকুতাকা", বেচারাকে দেখা যায় কি না। নয় হাজার বছর আগে সে একবার পৃথিবীকে দেখতে এসেছিল— এখন আবার দেখছে। আবারও আসবে নয় হাজার বছর পর। নয় হাজার বছর পর বাংলাদেশকে সে কেমন দেখবে কে জানে!

ধূমকেতু খুঁজে পাচ্ছি না। সপ্তর্ষিমণ্ডলের নিচেই তার থাকার কথা। উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল পাওয়া গেল। এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন হিসেবে জ্বলজ্বল করছে সপ্তর্ষি।

ফুপা জড়ানো গলায় বললেন, কী খুঁজছিস হিমু?'

"'হায়াকুতাকা"-কে খুঁজছি।'

'সে কে?'

'ধূমকেতু ।

'চাইনিজ ধূমকেতু না কি? হায়াকুতাকা— নামটা তো মনে হয় চাইনিজ ।'

'জাপানিজ নাম ।'

'ও আচ্ছা, জাপানিজ... একটা দেশ কোথায় ছিল, এখন কোথায় উঠে গেছে দ্যাখ... ধূমকেতু-ফেতু সব নিয়ে নিচ্ছে- আমরা কিছুই নিতে পারছি না। বঙ্গোপসাগরে তালপট্টি সেটাও চলে গেল। চলে গেল কি না তুই বল হিমু?'

'জি, চলে গেছে।'

'বেঁচে থেকে তা হলে লাভ কী?"

'বেঁচে থাকলে আনন্দ করা যায়। মাঝেমধ্যে মদ্যপান করা যায়...'

'এতে লিভারের ক্ষতি হয় ।'

'তা হয় ।'

'পরিমিত খেলে হয় না । পরিমিত খেলে লিভার ভালো থাকে ।'

ফুপার কথা আমি এখন আর শুনছি না। আমি ধূমকেতু খুঁজছি। ধূমকেতুও আমার মতোই পরিব্রাজক- সেও শুধুই হেঁটে বেড়ায়... ।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ১১

'আসগর সাহেব কেমন আছেন?'

আসগর সাহেব চোখ মেলে তাকালেন। অদ্ভুত শূন্য দৃষ্টি। আমাকে চিনতে পারছেন বলে মনে হলো না।

'দেশ তে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আপনার অপারেশন কবে হবে?'

'আজ সন্ধ্যায় ।'

'ভালো খুব ভালো।'

'হিমু ভাই!'

'বলুন।'

'আপনার চিঠির জন্যে কাগজ কিনিয়েছি,-কলম কিনিয়েছি। রেডিওবন্ড কাগজ, পার্কার কলম |'

'কে কিনে দিল?'

'একজন নার্স আছেন, সোমা নাম । তিনি আমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁকে বলেছিলাম, তিনি কিনেছেন।'

'খুব ভালো হয়েছে। অপারেশন শেষ হোক, তারপর চিঠি লেখালেখি হবে।'

'জি না ।'

'জি না মানে?'

'আমি বাঁচব না হিমু ভাই, যা লেখার আজই লিখতে হবে।'

'আপনার যে-অবস্থা আপনি লিখবেন কীভাবে? আপনি তো কথাই বলতে পারছেন না!'

আসগর সাহেব যন্ত্রের মতো বললেন, যা লেখার আজই লিখতে হবে!

তিনি মনে হলো একশো ভাগ নিশ্চিত, অপারেশনের পরে তাকে আর পাওয়া যাবে না। বিদায়ের ঘণ্টা তিনি মনে হয় শুনতে পাচ্ছেন।

'হিমু ভাই!'

'বলুন, শুনছি।'

'আপনার জন্যে কিছুই করতে পারি নাই। চিঠিটাও যদি লিখতে না পারি তা হলে মনে কষ্ট নিয়ে মারা যাব।'

'মনে কষ্ট নিয়ে মরার দরকার নেই– নিন, চিঠি লিখুন। কলমে কালি আছে?'

'জি, সব ঠিকঠাক করা আছে। হাতটা কাপে হিমু ভাই- লেখা ভালো হবে না। আমাকে একটু উঠিয়ে বসান।'

'উঠে বসার দরকার নেই। শুয়ে শুয়ে লিখতে পারবেন। খুব সহজ চিঠি । একটা তারা আঁকুন, আবার একটু গ্যাপ দিয়ে চারটা তারা, আবার তিনটা । এইরকম- দেখুন আমি লিখে দেখাচ্ছি—'

আসগর সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, এইসব কী!

আমি হাসিমুখে বললাম, এটা একটা সাংকেতিক চিঠি। আমি মেয়েটার কাছ থেকে একটা সাংকেতিক চিঠি পেয়েছিলাম। কাজেই সাংকেতিক ভাষায় চিঠির জবাব ।

'তারাগুলির অর্থ কী?'

'এর অর্থটা মজার- কেউ ইচ্ছা করলে I love you. একটা তারা I, চারটা তারা হলো Love, তিনটি তারা হলো You. আবার কেউ ইচ্ছা করলে অর্থ করতে করতে পারে- I hate you.

আসগর সাহেব কাঁপা-কাঁপা হাতে স্টার এঁকে দিলেন । আমি সেই তারকাচিহ্নের চিঠি পকেটে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম — আসগর সাহেবের দিকে তাকিয়ে সহজ গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে তা হলে আর দেখা হচ্ছে না?

'জি না ।'

'মৃত্যু কখন হবে বলে আপনার ধারণা?'

আসগর সাহেব জবাব দিলেন না। আমি বললাম, রাতে একবার এসে খোঁজ নিয়ে যাব । মরে গেলে তো চলেই গেলেন। বেঁচে থাকলে কথা হবে।

'জি আচ্ছা ?'

'আর কিছু কি বলবেন? মৃত্যুর পর আত্মীয়স্বজনকে কিছু বলা কিংবা...'

'মনসুরের পরিবারকে টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন ভাইসাব। মনসুর এসে পরিবারের ঠিকানা দিয়ে গেছে।'

ঠিকানা দিয়ে গেছে।'

'ঠিকানা কী?'

'কাগজে লিখে রেখেছি- পোস্টাপিসের কিছু কাগজ, পাশবই সব একটা বড় প্যাকেটে ভরে রেখে দিয়েছি। আপনার নামে অথরাইজেশন চিঠিও আছে।'

'ও আচ্ছা, কাজকর্ম গুছিয়ে রেখেছেন?'

'জি-যতদূর পেরেছি।'

'অনেকদূর পেরেছেন বলেই তো মনে হচ্ছে- ফ্যাকড়া বাধিয়েছে মনসুর- সে যদি ভূত হয়ে সত্যি সত্যি তার পরিবারের ঠিকানা বলে দিয়ে যায় তা হলে বিপদের কথা ।'

'কিসের বিপদ হিমু ভাই?'

'তা হলে তো ভূত বিশ্বাস করতে হয়। রাত-বিরাতে হাঁটি, কখন ভূতের খপ্পরে পড়ব!'

'জগৎ বড় রহস্যময় হিমু ভাই।'

'জগৎ মোটেই রহস্যময় না। মানুষের মাথাটা রহস্যময়। যা ঘটে মানুষের মাথার মধ্যে ঘটে। মনসুর এসেছিল আপনার মাথার ভেতর। আমার ধারণা, সে তার পরিবারের ঠিকানা ঠিকই দিয়েছে। আপনার মাথা কিভাবে কিভাবে এই ঠিকানা বের করে ফেলেছে।'

'আপনার কথা বুঝতে পারছি না হিমু ভাই।'

'বুঝতে না পারলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমি নিজেও আমার সব কথা বুঝতে পারি না ।'

আমি আসগর সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। গফুরের মেয়েটার সঙ্গে দুটা কথা বলার ইচ্ছা ছিল। মেয়েটাকে দেখলাম না। গফুর তার বিছানায় হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। তার মুখের উপর একটা মাছি ভনভন করছে, সেই মাছি তাড়াবার চেষ্টা করছেন বয়স্কা এক মহিলা। সম্ভবত গফুরের স্ত্রী। স্বামীকে তিনি নির্বিঘ্নে ঘুমুতে দিতে চান।

রিকশা নিয়ে নিলাম। মারিয়ার বাবাকে দেখতে যাব। পাঁচ বছর পর ভদ্রলোককে দেখতে যাচ্ছি। এই পাঁচ বছরে তিনি আমার কথা মনে করেছেন। আমি গ্রেফতার হয়েছি শুনে চিন্তিত হয়ে চারদিকে টেলিফোন করেছেন। আমি তার কথা মনে করিনি। আমি আমার বাবার কঠিন উপদেশ মনে রেখেছি—

প্রিয় পুত্র,

মানুষ মায়াবদ্ধ জীব। মায়ায় আবদ্ধ হওয়াই তাহার নিয়তি । তোমাকে আমি মায়ামুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া বড় করিয়াছি। তার পরেও আমার ভয়- একদিন ভয়ংকর কোনো মায়ায় তোমার সমস্ত বোধ, সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হইবে । মায়া কূপবিশেষ, সে-কূপের গভীরতা মায়ায় যে আবদ্ধ হইবে তাহার মনের গভীরতার উপর নির্ভরশীল। আমি তোমার মনের গভীরতা সম্পর্কে জানি– কাজেই ভয় পাইতেছি- কখন-না তুমি মায়া-নামক অর্থহীন কূপে আটকা পড়িয়া যাও। যখনই এইরূপ কোনো সম্ভাবনা দেখিবে তখনই মুক্তির

জন্য চেষ্টা করিবে। মায়া-নামক রঙিন কূপে পড়িয়া জীবন কাটানোর জন্য তোমার জন্ম হয় নাই। তুমি আমার সমগ্র জীবনের সাধনাকে নষ্ট করিও না।...

আমি আমার অপ্রকৃতিস্থ পিতার সমগ্র জীবনের সাধনাকে নষ্ট করিনি। আমি যখনই মায়ার কূপ দেখেছি তখনই দূরে সরে গেছি। দূরে সরার প্রক্রিয়াটি কত যে কঠিন তা কি আমার অপ্রকৃতিস্থ দার্শনিক পিতা জানতেন? মনে হয় জানতেন না। জানলে মায়ামুক্তির কঠিন বিধান রাখতেন না ।

আসাদুল্লাহ সাহেব আজ এতদিন পরে আমাকে দেখে কী করবেন? খুব কি উল্লাস প্রকাশ করবেন? না, তা করবেন না । যেসব মানুষ সীমাহীন আবেগ নিয়ে জন্মেছেন তারা কখনো তাদের আবেগ প্রকাশ করেন না। তাদের আচার-আচরণ রোবটধর্মী। যারা পৃথিবীতে এসেছেন মধ্যম শ্রেণীর আবেগ নিয়ে, তাদের আবেগের প্রকাশ অতি তীব্র। এঁরা প্রিয়জনদের দেখামাত্র জড়িয়ে ধরে কেঁদেকেটে হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেন।
আমার ধারণা, আসাদুল্লাহ সাহেব আমাকে দেখে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলবেন, তারপর—কী খবর হিমু সাহেব?
এই যে দীর্ঘ পাঁচ বছর দেখা হলো না সে-প্রসঙ্গে একটা কথাও বলবেন না । পুলিশের হাতে কীভাবে ধরা পড়েছি, কীভাবে ছাড়া পেয়েছি সেই প্রসঙ্গেও কোনো কথা হবে না। দেশ নিয়েও কোনো কথা বলবেন না। আওয়ামী লীগ, বিএনপি নিয়ে তাঁর কোনো মাথাব্যাথা নেই। ক্ষুদ্র একটি ভূখণ্ডকে তিনি দেশ ভাবেন না। তার দেশ হচ্ছে অনন্ত নক্ষত্রবীথি। তিনি নিজেকে অনন্ত নক্ষত্রবীথির নাগরিক মনে করেন। এইসব নাগরিকের কাছে জাগতিক অনেক কর্মকাণ্ডই তুচ্ছ। বাবা বেঁচে থাকলে আমি অবশ্যই পরিচয় করিয়ে দিতাম। দুজন দুমেরু থেকে কথা শুরু করতেন। সেইসব কথা না জানি শুনতে কত সুন্দর হতো!

মারিয়ার মা'কে আমি খালা ডাকি । হাসিখালা । মহিলারা চাচির চেয়ে খালা ডাক বেশি পছন্দ করেন। খালা ডাক মায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অনেক কাছের ডাক। খালা ডেকেও আমার তেমন সুবিধা অবিশ্যি হয়নি। ভদ্রমহিলা গোড়া থেকেই আমাকে তীব্র সন্দেহের চোখে দেখেছেন। তবে আচার-আচরণে কখনো তা প্রকাশ হতে দেননি। বরং বাড়াবাড়ি রকম আন্তরিকতা দেখিয়েছেন। হাত দেখার প্রতি এই মহিলার খুব দুর্বলতা আছে। আমি বেশ কয়েকবার তার হাত দেখে দিয়েছি । হস্তরেখা-বিশারদ হিসেবে ভদ্রমহিলার কাছে আমার নাম আছে। তিনি অতি আন্তরিক ভঙ্গিতে আমার সঙ্গে তুই-তুই করেন। সেই আন্তরিকতার পুরোটাই মেকি । পাঁচ বছর পর এই মহিলাও অবিকল তার স্বামীর মতো আচরণ করবেন। স্বাভাবিক গলায় বলবেন, "কী রে হিমু তোর খবর কী? দে, হাতটা দেখে দে।" তিনি এজাতীয় আচরণ করবেন আবেগ চাপা দেবার জন্যে না, আবেগহীনতার জন্যে। আর মারিয়া? মারিয়া কী করবে? কিছুই বলতে পারছি না। এই মেয়েটি সম্পর্কে আমি কখনোই আগেভাগে কিছু বলতে পারিনি। তার আচার-আচরণে বোঝার কোনো উপায় ছিল না-একদিন সে এসে আমার হাতে এক টুকরা কাগজ ধরিয়ে দেবে- যেকাগজে সাংকেতিক ভাষায় একটা প্রেমপত্র লেখা ।

আমি সেদিন আসাদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে একটা কঠিন বিষয় নিয়ে গল্প করছিলাম। বিষয়বস্তু এক্সপ্যান্ডিং ইউনিভার্স। আসাদুল্লাহ সাহেব বলেছিলেন ইউনিভার্সে যতটুকু ভর থাকার কথা ততটুকু নেই- বিজ্ঞানীরা হিসাব মেলাতে পারছেন না। নিউট্রিনোর যদি কোনো ভর থাকে তবেই হিসাব মেলে। এখন পর্যন্ত এমন কোনো আলামত পাওয়া যায়নি যা থেকে বিজ্ঞানীরা নিউট্রিনোকে কিছু ভর দিতে পারেন। নিউট্রিনোর ভর নিয়ে আমাদের দুজনের দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। এমন দুশ্চিন্তাযুক্ত জটিল আলোচনার মাঝখানে মারিয়া এসে উপস্থিত। সে তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল,— বাবা আমি হিমু ভাইকে পাঁচ মিনিটের জন্য ধার নিতে পারি?

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, অবশ্যই!

মারিয়া বলল, পাঁচ মিনিট পরে আমি তাকে ছেড়ে দেব। তুমি যেখানে আলোচনা বন্ধ করেছিলে আবার সেখান থেকে শুরু করবে।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, আচ্ছা ।

"তোমরা আজ কী নিয়ে আলাপ করছিলে?"

'নিউট্রিনোর ভর।'

'ও, সেই নিউট্রিনো? তার কোনো গতি করতে পেরেছ?'

'না।'

'চেষ্টা করে যাও বাবা । চেষ্টায় কী না হয়!'

মারিয়া তার বাবার কাঁধে রখে সুন্দর করে হাসল। আসাদুল্লাহ সাহেব সেই হাসি ফেরত দিলেন না । গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। তার মাথায় তখন নিউট্রিনো। আমি তার হয়ে মারিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসলাম ।

মারিয়া বলল, হিমু ভাই, আপনি আমার ঘরে আসুন ।

আমি মারিয়ার ঘরে ঢুকলাম। এই প্রথম তার ঘরে ঢোকা। কিশোরী মেয়েদের ঘর যেরকম হয় সেরকম। র্যাকভরতি স্টাফড় অ্যানিমেল । স্টেরিও সিস্টেম, এলপি রেকর্ড সারা ঘরময় ছড়ানো। ড্রেসিংটেবিলে এলোমেলো করে রাখা সাজবার জিনিস । বেশিরভাগ কৌটার মুখ খোলা । কয়েকটা ড্রেস মেঝেতে পড়ে আছে। খাটের পাশে রকিং-চেয়ারে গাদা করা গল্পের বই । খাটের নিচে তিনটা চায়ের কাপ । এর মধ্যে একটা কাপে পিঁপড়া উঠেছে। নিশ্চয়ই কয়েকদিনের বাসি কাপ, সরানো হয়নি।

আমি বললাম, তোমার ঘর তো খুব গোছানো।

মারিয়া বলল, আমি আমার ঘরে কাউকে ঢুকতে দিই না। মাকেও না, বাবাকেও না। আপনাকে প্রথম ঢুকতে দিলাম। আমার ঘর আমি নিজেই ঠিকঠাক করি। ক'দিন ধরে মনটন খারাপ বলে ঘর গোছাতে ইচ্ছা করছে না ।

'মন-খারাপ কেন?'

'আছে, কারণ আছে। আপনি দাড়িয়ে কেন? বসুন?'

আমি বসলাম । মারিয়া বলল, আমি সাংকেতিক ভাষায় একটা চিঠি লিখেছি।

'কাকে?'

'আপনাকে। আপনি এই চিঠি পড়বেন। এখানে বসেই পড়বেন । সাংকেতিক চিঠি হলেও খুব সহজ সংকেতে লেখা। আমার ধারণা, আপনার বুদ্ধি বেশ ভালো। চিঠির অর্থ আপনি এখানে বসেই বের করতে পারবেন।'

'সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে হবে?'

'হ্যা।'

'আমার বুদ্ধি খুবই নিম্নমানের। ম্যাট্রিকে অঙ্কে প্রায় ধরা খাচ্ছিলাম। সাংকেতিক চিঠি তো অঙ্কেরই ব্যাপার। এখানেও মনে হয় ধরা খাব।'

মারিয়া তার রকিং-চেয়ার আমার সামনে টেনে আনল। চেয়ারের উপর থেকে বই নামিয়ে বসে দোল খেতে লাগল আমি সাংকেতিক চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম । কিছু বুঝলাম না। তাকালাম মারিয়ার দিকে। সে নিজের মনে দোল খাচ্ছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে দেয়ালের দিকে । সেখানে তার ছোটবেলার একখানা ছবি । আমি বললাম, আমি কিছুই বুঝতে পারিনি।

মারিয়া বলল, বুঝতে না পারলে সঙ্গে করে নিয়ে যান। যেদিন বুঝতে পারবেন সেদিন উত্তর লিখে নিয়ে আসবেন। 'আর যদি কোনোদিনই বুঝতে না পারি?'

‘কোনোদিন বুঝতে না পারলে আর এ-বাড়িতে আসবেন না। এখন উঠুন, পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে । আপনাকে বাবার কাছ দিয়ে আসি ।’

আমি চিঠি-হতে উঠে দাঁড়ালাম ।

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ১২

মারিয়াদের বাড়ির নাম- চিত্রলেখা ।

আমি দীর্ঘ পাঁচ বছর পর চিত্রলেখার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মানুষ তাদের বাড়ির নাম কেন রাখে? তাদের কাছে কি মনে হয় বাড়িগুলিও জীবন্ত? বাড়িদের প্রাণ আছে- তাদেরও অদৃশ্য হৃৎপিণ্ড ধকধক করে?

কলিংবেল টিপে অপেক্ষা করছি। কেউ এসে গেট খুলছে না। দারোয়ান তার খুপরিঘর থেকে আমাকে দেখতে পেয়েছে। আসছে না- কারণ উৎসাহ পাচ্ছে না। ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে কেউ এলে এরা উৎসাহ পায়। ছুটে এসে গেট খুলে স্যালুট নিয়ে দাঁড়ায়। যারা দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে আসে তাদের বেলা ভিন্ন নিয়ম। ধীরেসুস্থে এসে ধমকের গলায় বলবে- কাকে চান? দারোয়ানদের ধমক খেতে ইন্টারেস্টিং লাগে । এরা নানান ভঙ্গিতে ধমক দিতে পারে। কারও ধমকে থাকে শুধুই বিরক্তি, কারও ধমকে রাগ, কারও ধমকে আবার অবহেলা। একজনের ধমকে প্রবল ঘৃণাও পেয়েছিলাম। তার ঘৃণার কারণ স্পষ্ট হয়নি।

আমি আবারও বেল টিপে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমার এমনকিছু তাড়া নেই। ঘণ্টাখানিক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। তাড়া থাকে ভিখিরিদের । তাদের এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়িতে যেতে হয়। সময় তাদের কাছে খুবই মূল্যবান। আমার কাছে সময় মূল্যহীন। 'চিত্রলেখা'-নামের চমৎকার একতলা এই বাড়িটার সামনে একঘণ্টা দাড়িয়ে থাকাও যা, দুঘণ্টা দাড়িয়ে থাকাও তা। সময় কাটানোর জন্যে কিছুএকটা করা দরকার। বাড়ির নাম নিয়ে তারা যেতে পারে। আচ্ছা, মানুষের নামে যেমন পুরুষ-রমণী ভেদাভেদ আছে—বাড়ির নামেও কি তা-ই আছে? কোনো কোনো বাড়ি হবে পুরুষবাড়ি- কোনো কোনো বাড়ি রমণীবাড়ি। চিত্রলেখা নিশ্চয়ই রমণীবাড়ি। সুগন্ধা, শ্রাবণী, শিউলিও

মেয়েবাড়ি । পুরুষবাড়ির কোনো নাম মনে পড়ছে না। এখন থেকে রাস্তায় হাটার সময় বাড়ির নাম পড়তে পড়তে যেতে হবে, যদি কোনো পুরুষবাড়ির নাম চোখে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা ভালো করে দেখতে হবে।

আমাকে প্রায় ঘণ্টখানিক অপেক্ষা করতে হলো- এর মধ্যে দারোয়ানশ্রেণীর একজন গেটের কাছে এসেছিল। গেট খুলতে বলায় সে বলল, যার কাছে চাবি সে ভাত খাচ্ছে। ভাত খাওয়া হলে সে খুলে দেবে। আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনি কি চাৰিটা এনে একটু খুলে দিতে পারেননা? এই কথায় সে বড়ই আহত হলো। মনে হলো তার সুদীর্ঘ জীবনে সে এমন অপমানসূচক কথা আর শোনেনি। কাজেই আমি বললাম, আচ্ছা থাক, আমি অপেক্ষা করি। আপনার কাছে ছাতা থাকলে আমাকে কিছুক্ষণের জন্য দিন। আমি ছাতা-মাথায় দাঁড়িয়ে থাকি, প্রচণ্ড রোদ।

সে এই রসিকতাতেও অপমানিত বোধ করল। বড় মানুষের বাড়ির কাজের মানুষদের মনে অপমানবোধ তীব্র হয়ে থাকে।

‘আপনে কার কাছে আসছেন?’

‘মারিয়ার কাছে।’

‘আপা নাই।’

‘না থাকলেও আসবে- আমি অপেক্ষা করব। গেট খুলে দিন।’

‘গেট খুলনের নিয়ম নাই।’

আগের দারোয়ানদের কেউ নেই- সব নতুন লোকজন। আগেকার কেউ হলে চিনতে পারত। এত ঝামেলা হতো না। আমি বিনীত ভঙ্গিতে বললাম, ভাইসাহেব, আপনার নাম?

‘আমার নাম আবদুস সোবহান ।’

‘সোবহান সাহেব আপনি শুনুন- আমি খুব পাগলা কিসিমের লোক। গেট না খুললে গেটের উপর দিয়ে বেয়ে চলে আসব। আপনার সাহেবের কাছে গিয়ে বলুন- হিমু এসেছে।’

'ও আচ্ছা, আপনে হিমু? আপনের কথা বলা আছে।'

দারোয়ান ব্যস্ত হয়ে গেট খুলতে লাগল ।

আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । বিশাল ড্রয়িংরুম পার হয়ে খানিকটা খোলামেলা জায়গায় চলে এসেছি। কোনো ফার্নিচার নেই । ঘরময় কাপেট । এটা ফ্যামিলি-রুম । ফ্যামিলির সদস্যরা এই ঘরে গল্পগুজব করে, টিভি দেখে। যাদের ফ্যামিলি যত ছোট তাদের ফ্যামিলি-রুমটা তত বিশাল । মারিয়াদের ড্রয়িংরুম আগের মতোই ছিল, তবে ফ্যামিলি-রুমের সাজসজ্জা বদলেছে। প্রকাণ্ড এক পিয়ানো দেখতে পাচ্ছি। পিয়ানো আগে ছিল না । পিয়ানো কে বাজায়? মারিয়া?

ফ্যামিলি-রুমে কার্পেটের উপর হাসিখালাকে বসে থাকতে দেখলাম । তিনি তাঁর দুহাত মেলে ধরেছেন। সেই হাতের নখে নেলপালিশ লাগাচ্ছেন সিরিয়াস চেহারার এক ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের চোখে সোনালি চশমা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তিনি খুব একটা বাহারি পাঞ্জাবি পরে আছেন। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই বিখ্যাত ও ক্ষমতাবানদের কেউ হবেন। এবাড়িতে বিখ্যাত ও ক্ষমতাবান ছাড়া অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই। নেলপালিশ লাগানোর ব্যাপারে ভদ্রলোকের মনোযোগ দেখে মনে হচ্ছে কাজটা অত্যন্ত জটিল । হাসিখালাও নড়াচড়া করছেন না। স্থির হয়ে আছেন। হাসি খালা এক ঝলক আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হিমু, তোর কী খবর?

'কোনো খবর নেই।"

'মারিয়া বলেছিল তুই আসবি ।'

যে-ভদ্রলোক নেপলিশ লাগছেন ভিন্ন রক্ত গলায় বললেন, হাসি, নড়াচড়া করবে না। নড়লে আঙুল নড়ে যায়।

আমি বললাম, খালা, হচ্ছে কী?

হাসিখালা বললেন, কী হচ্ছে তা তো দেখতেই পাচ্ছিস । নতুন কায়দায় নেলপলিশ লাগানো হচ্ছে। নখের গোড়ায় কড়া লাল রঙ । আস্তে আস্তে নখের মাথায় এসে রঙ মিলিয়ে যাবে।

'জটিল ব্যাপার মনে হচ্ছে ।'

'জটিল তো বটেই। জিনিসটা দাঁড়ায় কেমন সেটা হচ্ছে কথা। একধরনের এক্সপেরিমেন্ট ।'

ভদ্রলোক আরেকবার বিরক্ত গলায় বললেন- হাসি, প্লিজ।

আমি কিছুক্ষণ নেলপালিশ দেয়া দেখলাম। গাঢ় লাল, হালকা লাল, সাদা— তিন রঙের কৌটা, নেলপালিশ রিমুভার নিয়ে প্রায় হুলুস্থূল ব্যাপার হচ্ছে।

হাসিখালা বললেন, জামিল, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি! এ হচ্ছে হিমু। ভালো নাম এভারেস্ট, কিংবা হিমালয় । মারিয়ার বাবার অনেক আবিষ্কারের এক আবিষ্কার। খুব ভালো হাত দেখতে পারে। হাত দেখে যা বলে তা-ই হয় ।

ভদ্রলোক চোখমুখ কুঁচকে ফেললেন। আমি সামনে থেকে সরলে তিনি বাঁচেন এই অবস্থা।

আমি বিনয়ী গলায় বলরাম, স্যার, ভালো আছেন?

ভদ্রলোক বললেন, ইয়েস, আই অ্যাম ফাইন। থ্যাঙ্ক য়্যু।

'আপনার নেলপলিশ দেয়া খুব চমৎকার হচ্ছে স্যার।'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি কঠিন হয়ে গেল হাসিখালী বললেন, তুই যা, মারিয়ার বাবার সঙ্গে দেখা করে আয়। আর শোন, চলে যাবার আগে আমার হাত দেখে দিবি । জামিল, তুমি কি হিমুকে দিয়ে হাত দেখাবে?

জামিল নামের ভদ্রলোক নেলপলিশের রঙ মেশানোর ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শীতল গলায় বললেন, এইসব আধিভৌতিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস নেই।

আমি বললাম, আধিভৌতিক বলে সবকিছু উড়িয়ে দেয়া ঠিক হবে না স্যার । অ্যাস্ট্রলজি ছিল আধিভৌতিক ব্যাপার। সেই অ্যাস্ট্রলজি থেকে জন্ম নিয়েছে আধুনিক অ্যাস্ট্রনমি ।

একসময় আলকেমিও ছিল আধিভৌতিক । সেই আলকেমি থেকে আমরা পেয়েছি আধুনিক রসায়নবিদ্যা।

জামিল সাহেব বললেন, মিস্টার এভারেস্ট, এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাচ্ছি না। আমি একটা কাজ করছি। যদি কখনো সুযোগ হয় পরে কথা হবে।

'জি আচ্ছা, স্যার।'

আমি আসাদুল্লাহ সাহেবের ঘরে ঢুকে পড়লাম । এই ঘর আগের মতোই আছে। একটুও বদলায়নি। খাটে শুয়ে থাকা মানুষটা শুধু বদলেছে। ভরাট স্বাস্থ্যের সেই মানুষ নেই। রোগাভোগা একজন মানুষ। মাথাভরতি চুল ছিল ল কমে গেছে। চোখের তীব্র জ্যোতিও ম্লান। নিজের তৈরি বেহেশতে জীবনযাপন করতে করতে তিনি সম্ভবত ক্লান্ত।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, কেমন আছ হিমু?

'ভালো।'

'তোকে দেখে আমার ভালো লাগছে।'

'আপনাকে দেখে আমার তেমন ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।'

'স্বর্গেবাস করা ক্লান্তিকর ব্যাপার হিমু। আমি আসলেই ক্লান্ত । সময় কাটছে না ।'

'সময় কাটছে না কেন?'

'কীভাবে সময় কাটাব সেটা বুঝতে পারছি না। এখন বই পড়তে পারি না।'

'বই পড়তে পারেন না?'

'না। বই পড়তে ভালো লাগে না, গান শুনতে ভালো লাগে না, শুয়ে থাকতে ভালো লাগে না। যা ভালো লাগে না, তা করি না। বই পড়ি না, গান শুনি না। কিন্তু শুয়ে থাকতে ভালো না লাগলেও শুয়ে থাকতে হচ্ছে। আই হ্যাভ নো চয়েস। তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন হিমু, বসো। আমার বিছানায় বসো ।'

আমি বসলাম। আসাদুল্লাহ সাহেব মুখ টিপে খানিকক্ষণ মিটমিট করে হাসলেন । কেন হাসলেন ঠিক বোঝা গেল না । হঠাৎ মুখ থেকে হাসি মুছে ফেলে গম্ভীর গলায় বললেন– এখন আমি কী করছি জান?

'জি না, জানি না। আপনি বলুন, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছি।'

'আমি যা করছি তা হচ্ছে মানসিক গবেষণা ।'

'সেটা কী?'

'মনে মনে গবেষণা। কোনো-একটা বিষয় নিয়ে জটিল সব চিন্তা করছি, কিন্তু সবই মনে মনে। আমার সাম্প্রতিক গবেষণার বিষয় হলো- নারী-পুরুষ সম্পর্ক।'

'প্রেম?'

'হ্যাঁ, প্রেম । হিমু, তুমি কখনো কোনো মেয়ের প্রেমে পড়েছ?'

'না ।'

'মেয়েরা তোমার প্রেমে পড়েছে?'

'না।'

'তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, নিশ্চিত ।'

আসাদুল্লাহ সাহেব আগ্রহ নিয়ে বললেন, প্রেম সম্পর্কে তোমার ধারণাটা কী বলো ।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি তো এইসব নিয়ে গবেষণা করছি না, কাজেই বলতে পারছি না। আপনি বরং বলুন গবেষণা করে কী পেয়েছেন।

"শুনতে চাও?'

'হ্যা, চাই।'

আসাদুল্লাহ সাহেব বুকের নিচে বালিশ দিয়ে একটু উঁচু হলেন । কথা বলা শুরু করলেন শান্ত ভঙ্গিতে এবং খুব উৎসাহের সঙ্গে।

'হিমু শোনো, গবেষণা না- শয্যাশায়ী মানুষের ব্যক্তিগত চিন্তা। চিন্তাও ঠিক না- ফ্যান্টাসি। আমার মনে হয় কী জান? সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃতি প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পাঁচটি অদৃশ্য নীলপদ্ম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান। এই নীলপদ্মগুলি হলো- প্রেমভালোবাসা। যেমন ধরো তুমি । তোমাকে পাঁচটি নীলপদ্ম দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত তুমি কাউকে পাওনি যাকে পদ্ম দিতে ইচ্ছে করেছে। কাজেই তুমি কারোর প্রেমে পড়নি। আবার ধরো, একটা সতেরো বছরের তরুণীর সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো । মেয়েটির তোমাকে এতই ভালো লাগলো যে, সে কোনোদিকে না তাকিয়ে ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে তার সবকটি নীলপদ্ম তোমাকে দিয়ে দিল । তুমি পদ্মগুলি নিলে, কিন্তু তাকে গ্রহণ করলে না। পরে এই মেয়েটি কিন্তু আর কারও প্রেমে পড়তে পারবে না । সে হয়তো একসময় বিয়ে করবে, তার স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসার করবে, কিন্তু স্বামীর প্রতি প্রেম তার থাকবে না ।'

আমি বললাম, আর আমার কী হবে? আমার নিজের পাঁচটি নীলপদ্ম ছিল, তার সঙ্গে আরও পাচটি যুক্ত হয়ে পদ্মের সংখ্যা বেড়ে গেল না?

'হ্যা, বাড়ল ।'

'তা হলে আমি কি ইচ্ছা করলে এখন কাউকে পাচটির জায়গায় দশটি পদ্ম দিতে পারি?'

'তা পার না। অন্যের পদ্ম দেয়া যাবে না। তোমাকে যে-পাঁচটি দেয়া হয়েছে শুধু সেই পাঁচটি দেয়া যাবে।'

'পাঁচটি কেন বলেছেন? পাঁচের চেয়ে বেশি নয় কেন?'

'পাঁচ হচ্ছে একটা ম্যাজিক-সংখ্যা। এইজন্যেই বলছি পাঁচ । আমাদের ইন্দ্রিয় পাঁচটি। বেশিরভাগ ফুলের পাপড়ি থাকে পাঁচটি। পাঁচ হচ্ছে একটি মৌলিক সংখ্যা । তবে পাঁচের ব্যাপারটা আমার কল্পনা, পাঁচের জায়গায় সাতও হতে পারে। আমার হাইপথিসিস তোমার কাছে কেমন লাগছে?'

'চমৎকার লাগছে।'

‘আজকাল আমি দিনরাত এটা নিয়েই ভাবি। আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ নীলপদ্ম নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, দেয়ার মানুষ পায় না।’

‘”অনেকে হয়তো দিতেও চায় না।’

‘হ্যাঁ, তাও হতে পারে। অনেকে পদ্মগুলি হাতছাড়া করতে চায় না। আবার এমনও হতে পারে, পদ্মগুলি দেয়া হয় ভুল মানুষকে । যাকে দেয়া হলো সে পদ্মের মূল্যই বুঝল না। এই হচ্ছে আমার নীলপদ্ম থিওরি। তোমাকে বললাম, তুমি তো নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াও, অনেকের সঙ্গে মেশ, আমার থিওরিটা পরীক্ষা করে দেখো।’

‘জি আচ্ছা। তবে আমার কী মনে হয় জানেন? আমার মনে হয়, কিছু-কিছু রহস্যময় ব্যাপার সম্পর্কে কোনো থিওরি না দেয়াই ভালো। থিওরি বা হাইপোথিসিস রহস্য নষ্ট করে। থাকুক-না কিছু রহস্য। সন্ধ্যাবেলা সূর্য ডোবে, সকালে ওঠে। কত রহস্যময় একটা ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্যে এটা হচ্ছে জানার পর আর রহস্য থাকে না।’

‘হিমু, তুমি কি জ্ঞানের বিপক্ষে?’

‘জি। জ্ঞান একধরনের বাধা। একধরনের অন্ধকার। কোনো বিষয় সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান নেই বিষয়টি সম্পর্কে আমদের দূরত্ব তৈরি করিয়ে দেয়।’

‘বুঝতে পারছি না।’

‘যেমন ধরুন, আপনার নীলপদ্ম থিওরি। এটা জানার পর থেকে আমার কী হবে জানেন? কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই আমি ভাবব, আচ্ছা, এই মেয়েটিকে কি নীলপদ্ম দেয়া যায়? দেয়া গেলে কটা দেয়া যায়? মেয়েটি তার নিজের নীলপদ্মগুলি কী করেছে? কাউকে দিয়ে ফেলেছে?’

‘আমার হাইপথিসিস তুমি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? তোমাকে তো আগেই বলেছি এসব আর কিছুই না, একজন অসুস্থ শয্যাশায়ী মানুষের ব্যক্তিগত প্রলাপ।’

আসাদুল্লাহ সাহেব হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলেন। সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আমি আসি ।

আসাদুল্লাহ সাহেব বললেন, তোমার কি মারিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

'জি না ।'

'মারিয়া বাসাতেই আছে। নিজের ঘরে বসে আছে। ও কারও সঙ্গেই দেখা করে না, কথা বলে না। এমনকি আমার

সঙ্গেও না ।'

'তাই নাকি?'

'তুমি যাবার আগে অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা করে যাবে।'

'কারও সঙ্গেই যখন দেখা করে না— আমার সঙ্গেও করবে না।'

আসাদুল্লাহ সাহেব হাসলেন । পুরানো দিনের সেই চমৎকার হাসি। আমি চমকে উঠলাম ।

'হিমু!'

'জি?'

'আমি আমার নীলপদ্ম থিওরি মারিয়াকে দেখে দেখেই তৈরি করেছি। মারিয়া তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি তোমাকে

লেখে। খুব অল্প বয়সে লেখে। কাজেই আমার থিওরি অনুযায়ী তার সবকটা নীলপদ্ম তোমার কাছে।'

'চিঠি লেখার ব্যাপারটি আপনি জানেন?'

‘হ্যাঁ, জানি। আমার মেয়ের সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল, সে তার জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি আমাকে দেখিয়ে লিখবে ।

মারিয়া চুক্তি রক্ষা করেছে। আমাকে চিঠিটি দেখিয়েছে, তবে আমি যেন বুঝতে না পারি সেজন্যে ছেলেমানুষি এক সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করেছে ।’

‘আপনি সেই সাংকেতিক চিঠির সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছেন?’

‘অবশ্যই। তবে ভান করেছি ত পারিনি।’

মারিয়া সেই চিঠি কাকে লিখেছিল তা কি আপনাকে বলেছে?’

‘না। তবে আমি অনুমান করেছি। আমার অনুমানশক্তি খারাপ না । হিমু শোনো, আমার মেয়েটা পড়াশোনার জন্যে

ইংল্যান্ড চলে যাচ্ছে। আমি নিজেই জোর করে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মনের যে-শক্তি মানুষকে চালিত করে আমার মেয়েটার মনের সেই শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। ওকে সেই শক্তি ফেরত দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কাজটা আমি তোমাকে দিয়ে করাতে চাই। এইজন্যেই তোমাকে এত ব্যস্ত হয়ে খুঁজছি।’

‘মনের শক্তি জাগানোর কাজটা আপনি করতে পারছেন না কেন?’

‘আমার উপর মেয়েটির যে-বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে।’

‘কেন?’

আসাদুল্লাহ সাহেব আরেকটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, তুমি কি লক্ষ্য করেছ মারিয়ার মা’র নখে এক ভদ্রলোক নেলপলিশ লাগাচ্ছেন?

‘হ্যাঁ, লক্ষ্য করেছি।’

‘নেলপালিশের এই এক্সপেরিমেন্ট অনেকদিন ধরেই করা হচ্ছে । মারিয়ার মা ঐ ভদ্রলোকের প্রেমে পড়েছে। তারা শিগগিরই বিয়ে করবে। আমি সব জেনেও কিছু বলছি না। মারিয়া এতেও আহত হয়েছে। জীবনে সে বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছে।’

‘আমাকে কী করতে বলেন?’

‘ওকে জীবনের জটিলতার অংশটার কথা বুঝিয়ে বলো। ও তোমার কথা শুনবে, কারণ ওর নীলপদ্মগুলি তোমার কাছে।’

# হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম – ১৩ (শেষ)

মারিয়া বলল, বসুন।

তার চোখমুখ কঠিন, তবু মনে হলো সেই কাঠিন্যের আড়ালে চাপা হাসি ঝিকমিক করছে। সে সুন্দর একটা শাড়ি পরেছে। চাপা রঙের শাড়ি । রঙটা এমন যে মনে হচ্ছে ঘরে চাপাফুলের গন্ধ পাচ্ছি। গলায় লাল পাথর। চুনি নিশ্চয় না। চুনি এত বড় হয় না।

'রকিং-চেয়ারে আরাম করে বসে দোল খেতে খেতে কথা বলুন। বাবা আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, তা-ই তো?'

আমি দোল খেতে খেতে বললাম, হ্যাঁ।

'বাবার ধারণা, আমার মন খুব অশান্ত । সেই অশান্ত মন শান্ত করার সোনার কাঠি আপনার কাছে। তা-ই না?'

'এরকম ধারণা ওনার আছে বলেই তো মনে হচ্ছে!'

'এরকম অদ্ভুত ধারণার কারণ জানেন?'

'না।'

'কারণটা আপনাকে বলি–অ্যাকসিডেন্টের পর বাবা মানসিক দিক থেকে পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তখন তাকে কিছু কথা বলেন। তাতে তার মন শান্ত হয় । সেই থেকেই বাবার ধারণা হয়েছে মন শান্ত করার মতো কথা আপনি বলতে পারেন। ভালো কথা, বাবাকে আপনি কী বলেছিলেন?'

'আমার মনে নেই। উদ্ভট কথাবার্তা তো আমি সবসময়ই বলি। তাকেও মনে হয় উদ্ভট কিছুই বলেছিলাম।' 'আমাকেও তা হলে উদ্ভট কিছু বলবেন?'

'তোমাকে উদ্ভট কিছু বলব না। তুমি আমাকে যে-চিঠি লিখেছিলে আমি তার জবাব লিখে এনেছি। সাংকেতিক ভাষায় লিখে এনেছি।' মারিয়া হাত বাড়াল। তার চোখে চাপা কৌতুক

ঝকমক করছে। মনে হচ্ছে যেকোনো মুহূর্তে সে খিলখিল করে হেসে ফেলবে। যেন সে অনেক কষ্টে হাসি থামাচ্ছে।

'সাংকেতিক চিঠিটায় কী লেখা পড়তে পারছ?'

'পারছি এখানে লেখা I hate you.'

'I love you-ও তো হতে পারে।"সংকেতের ব্যাখ্যা সবাই তার নিজের মতো করে করে, আমিও তা-ই করলাম । আপনার আটটা তারার অনেক মানে করা যায়, যেমন

I want you.

I miss you.

I lost you.

আমি আমার পছন্দমতো একটা বেছে নিলাম।'

'মারিয়া, তোমার এই ঘরে কি সিগারেট খাওয়া যায়?'

'যায় না, কিন্তু আপনি খেতে পারেন।'

আমি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললাম, তুমি কি তোমার বাবার নীলপদ্ম থিওরির কথা জান?

মারিয়া এইবার হেসে ফেলল। কিশোরীর সহজ স্বচ্ছ হাসি। হাসতে হাসতে বলল, আজগুবি থিওরি। আজগুবি এবং হাস্যকর।

'হাস্যকর বলছ কেন?'

'হাস্যকর এইজন্যে বলছি যে, বাবার থিওরি অনুসারে আমার পাঁচটি নীলপদ্ম এখন আপনার কাছে। কিন্তু আমি আপনার প্রতি কোনো আকর্ষণ বোধ করছি না। আপনাকে দেখে কোনোরকম আবেগ, রোমাঞ্চ কিছুই হচ্ছে না। বরং কিশোরী বয়সে যে পাগলামিটা করেছিলাম তার জন্যে রাগ লাগছে। বাবার থিওরি ঠিক থাকলে কিশোরী বয়সে পাগলামির জন্যে এখন রাগ লাগত না ।'

'এখন পাগলামি মনে হচ্ছে?'

'অবশ্যই মনে হচ্ছে। হিমু ভাই, আমি সেই সময় কীসব পাগলামি করেছি একটু শুনুন। চা খাবেন?'

'না ।'

'খান একটু। আমি খাচ্ছি, আমার সঙ্গে খান। বসে থাকুন, আমি চা নিয়ে আসছি।'

মারিয়া বের হয়ে গেল। আমি নিজের মনে দোল খেতে লগলাম। দীর্ঘ পাঁচ বছরে মারিয়ার ঘরে কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা ধরার চেষ্টাও করছি। ধরতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে ঘরটা ঠিক আগের মতো আছে, আবার মনে হচ্ছে একেবারেই আগের মতো নেই। সবই বদলে গেছে। মারিয়ার ছোটবেলাকার ছবিটা শুধু আছে। ছবি বদলায় না ।

মারিয়া ট্রেতে করে মগভরতি দু'মগ চা নিয়ে ঢুকল। কোনো কারণে সে বোধহয় খুব হেসেছে। তার ঠোঁটে হাসি লেগে আছে।

'হিমু ভাই, চা নিন।'

আমি চা নিলাম। মারিয়া হাসতে হাসতে বলল, জামিল চাচার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছে?

'নখ-শিল্পী?'

'হ্যাঁ, নখ-শিল্পী। মা'র নখের শিল্পকর্ম তিনি কিছুক্ষণ আগে শেষ করেছেন। মা সেই শিল্পকর্ম দেখে বিস্ময়ে অভিভূত।'

'খুব সুন্দর হয়েছে?'

'দেখে মনে হচ্ছে নখে ঘা হয়েছে- রক্ত পড়ছে। মা'কে এই কথা বলায় মা খুব রাগ করল। মা'র রাগ দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। মা যত রাগ করে আমি তত হাসি । হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে। চায়ে চিনি-টিনি সব ঠিক হয়েছে?'

'হয়েছে।'

‘বাবার সঙ্গে মা’র কীভাবে বিয়ে হয়েছিল সেটা কি আপনি জানেন?’

‘না, জানি না। ঐ গল্প থাক— তোমার গল্পটা বলো। কিশোরী বয়সে কী পাগলামি করলে?’

‘আমার গল্পটা বলছি, কিন্তু মা’র গল্পটা না শুনলে আমারটা বুঝতে পারবেন না। মা হচ্ছেন বাবার খালাতে বোন। মা যখন ইন্টারমিডিয়েট পড়তেন তখন বাবার জন্যে মা’র মাথা-খারাপের মতো হয়ে গেল। বলা চলে পুরো উন্মাদিনী অবস্থা। বাবা সেই অবস্থাকে তেমন পাত্তা দিলেন না। মা কিছু ডেসপারেট মুভ নিলেন। তাতেও লাভ হলো না। শেষে একদিন বাবাকে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখে সিনেমার প্রেমিকাদের মতো একগাদা ঘুমের অষুধ খেয়ে ফেললেন। মা’র জীবনসংশয় হলো। এখন মরে-তখন মরে অবস্থা। বাবা হাসপাতালে মা’কে দেখতে গেলেন। মা’র অবস্থা দেখে তার করুণা হলো। বাবা হাসপাতালেই ঘোষণা করলেন-মেয়েটা যদি বাঁচে তাকে বিয়ে করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। মা বেঁচে গেলেন। তদের বিয়ে হলো। গল্পটা কেমন?’

‘ইন্টারেস্টিং।’

‘ইন্টারেস্টিং না, সিনেমাটিক । ক্লাসিক্যাল লাভ স্টোরি । প্রেমিককে না পেয়ে আত্মহননের চেষ্টা। এখন হিমু ভাই, আসুন, মা’র ক্ষেত্রে বাবার নীলপদ্ম থিওরি অ্যাপ্লাই করি। থিওরি অনুযায়ী মা তাঁর নীলপদ্মগুলি বাবাকে দিয়েছিলেন- সবক’টা দিয়ে দিয়েছিলেন। তা-ই যদি হয় তা হলে পড়ন্ত যৌবনে মা জামিল চাচাকে দেয়ার জন্যে নীলপদ্ম পেলেন কোথায়? জামিল চাচা বিবাহিত একজন মানুষ। তাঁর বড় মেয়ে মেডিকেলে পড়ছে। তিনি যখন-তখন এ-বাড়িতে আসেন। মা’র শোবার ঘরে দুজনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন। শোবার ঘরের দরজাটা তারা পুরোপুরি বন্ধও করেন না, আবার খোলাও রাখেন না। সামান্য ফাঁক করে রাখেন। মজার ব্যাপার না?’

আমি কিছুই বললাম না। আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে মারিয়ার হাসিহাসি মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম ।

'হিমু ভাই!'

'বলো ।'

'বাবার নীলপদ্মবিষয়ক হাস্যকর ছেলেমানুষি থিওরির কথা আমাকে বলবেন না।'

'আচ্ছা বলব না!'

'প্রেম নিতান্তই জৈবিক একটা ব্যাপার- নীলপদ্ম বলে একে মহিমান্বিত করার কিছু নেই।'

'তাও স্বীকার করছি।'

'হিমু ভাই, আপনি এখন বিদেয় হোন- আপনার চা আশা করি শেষ হয়েছে।'

'হ্যাঁ, চা শেষ।''আমাকে নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা করার কিছুই নেই। বাবার কাছে শুনেছেন নিশ্চয়ই, আমি বাইরে পড়তে চলে যাচ্ছি। এখানকার কোনোকিছু নিয়েই আর আমার মাথাব্যথা নেই। বাবার সময় কাটছে না, সেটা তার ব্যাপার। আমি দেখব আমার নিজের জীবন, আমার কেরিয়ার!'

'খুবই ভালো কথা ।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। মারিয়া বলল, ও আচ্ছা, আরও কয়েক মিনিট বসুন, আপনাকে নিয়ে কীসব পাগলামি করেছি তা বলে নিই। আপনার শোনার শখ ছিল ।

আমি বসলাম। মারিয়া আমার দিকে একটু ঝুঁকে এল । দামি কোনো পারফিউম সে গায়ে দিয়েছে। পারফিউমের হালকা সুবাস পাচ্ছি। হালকা হলেও সৌরভ নিজেকে জানান দিচ্ছে কঠিনভাবেই। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। মারিয়ার চুল খোলা। এই খোলা চুল ফ্যানের বাতাসে উড়ছে। কিছু এসে পড়ছে আমার মুখে। ভয়াবহ সুন্দর একটি দৃশ্য।

'হিমু ভাই!'

'বলো!'

'একটা সময়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। ভয়ংকর কষ্টের কিছু সময় পর করেছি। রাতে ঘুম হতো না। রাতের পর রাত জেগে থাকার জনেই হয়তো মাথাটা

খানিকটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যাপার হতো। অনেকটা হ্যালুসিনেশনের মতো। মনে করুন পড়তে বসেছি, হঠাৎ মনে হলো আপনি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার বই-এ আপনার ছায়া পড়েছে। তখন বুক ধকধক করতে থাকত। চমকে পেছনে তাকিয়ে দেখতাম— কেউ নেই। আপনাকে তখনই চিঠিটা লিখি। আপনি তার জবাব দেননি। আমাদের বাড়িতে আর আসেনওনি।'

'না এসে ভালোই করেছি। তোমার সাময়িক আবেগ যথাসময়ে কেটে গেছে। তুমি ভুল ধরতে পেরেছ।' 'হ্যাঁ, তা পেরেছি। ঐ সময়টা ভয়ংকর কষ্টে কষ্টে গেছে। রোজ ভাবতাম, আজ আপনি আসবেন । আপনি আসেননি। আপনার কোনো ঠিকানা নেই আমাদের কাছে যে আপনাকে খুঁজে বের করব। আমার সে-বছর এ লেভেল পরীক্ষা দেবার কথা ছিল । আমার পরীক্ষা দেয়া হয়নি। প্রথমত, বই নিয়ে বসতে পারতাম না। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হতো আমি পরীক্ষা দিতে যাব আর আপনি এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে যাবেন । আমি রোজ রাতে দরজা বন্ধ করে কাঁদতাম।'

বলতে বলতে মারিয়া হাসল। কিন্তু তার চোখে অনেকদিন আগের কান্নার ছায়া পড়ল। এই ছায়া সে হাসি দিয়ে ঢাকতে পারল না ।

আমি বললাম, তার পরেও তুমি বলছ নীলপদ্ম কিছু না- পুরো ব্যাপারটাই জৈবিক?

'হ্যাঁ, বলছি। তখন বয়স অল্প ছিল। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি। চারপাশে কী ঘটছে তা দেখে শিখছি।'

আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললাম, তোমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে খুবই দুঃখিত।

'চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার চিঠি নিয়ে যান। আট তারার চিঠি । এই হাস্যকর চিঠির আমার দরকার নেই।'

আমি চিঠি নিয়ে পকেটে রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আসাদুল্লাহ সাহেবের নীলপদ্ম থিওরি ঠিক আছে। এই তরুণী তার সমস্ত নীলপদ্ম হিমু নামের এক ছেলের হাতে তুলে দিয়ে তীব্র কষ্ট ও যন্ত্রণার ভেতর বাস করছে। এই যন্ত্রণা, এই কষ্ট থেকে তার মুক্তি নেই। আমি তাকালাম মারিয়ার দিকে। সে এখন মাথা নিচু করে বসে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। অশ্রু গোপন করার জন্যে মেয়েরা ঐ ভঙ্গিটা মাঝে মাঝে ব্যবহার করে।

'মারিয়া!'

'জি?'

'ভালো থেকো ।'

'আমি ভালোই থাকব ।'

'যাচ্ছি, কেমন?'

'আচ্ছা যান। আমি যদি বলি- আপনি যেতে পারবেন না, আপনাকে আমার সঙ্গে থাকতে হবে- আপনি কি থাকবেন? থাকবেন না। কাজেই যেতে চাচ্ছেন, যান।

'গেট পর্যন্ত এগিয়ে দাও।'

'না। ও আচ্ছা, আমার হাতটা দেখে দিয়ে যান। আমার ভবিষ্যৎটা কেমন হবে বলে দিয়ে যান ।'

মারিয়া তার হাত এগিয়ে দিল । মরিয়ার হাত দেখার জন্যে আমি আবার বসলাম।

'খুব ভালো করে দেখবেন। বানিয়ে বানিয়ে বলবেন না।'

'তোমার খুব সুখের সংসার হবে। স্বামী-স্ত্রী এবং একটি কন্যার অপূর্ব সংসার। কন্যাটির নাম তুমি রাখবে- চিত্রলেখা।'

মারিয়া খিলখিল করে হাসতে হাসতে হাত টেনে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল–থাক, আপনাকে আর হাত দেখতে হবে না। বানিয়ে বানিয়ে উদ্ভট কথা! আমি আমার মেয়ের নাম চিত্রলেখা রাখতে যাব কেন? দেশে নামের আকাল পড়েছে যে বাড়ির নামে মেয়ের নাম রাখব? যা-

ই হোক, আমি অবিশ্যি ভবিষ্যৎ জানার জন্য আপনাকে হাত দেখতে দিইনি। আমি আপনার হাত কিছুক্ষণের জন্য ধরতে চাচ্ছিলাম। এম্নিতে তো আপনি আমার হাত ধরবেন না, কাজেই অজুহাত তৈরি করলাম। হিমু ভাই, আপনি এখন যান। প্রচণ্ড রোদ উঠেছে, রোদে আপনার বিখ্যাত হাটা শুরু করুন।

মারিয়ার গলা ধরে এসেছে। সে আবার মাথা নিচু করে ফেলেছে। কয়েক মুহূর্তের প্রয়োজন নেই। মহাপুরুষ না, সাধারণ মানুষ হয়ে মমতাময়ী এই তরুণীটির পাশে এসে বসি । যে-নীলপদ্ম হাতে নিয়ে জীবন শুরু করেছিলাম, সেই পদ্মগুলি তার হাতে তুলে দিই। তার পরই মনে হলো- এ আমি কী করতে যাচ্ছি। আমি হিমু— হিমালয়।

মারিয়া বলেছিল সে গেট পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিতে আসবে না। কিন্তু সে এসেছে। গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের ভেতর মনে হচ্ছিল মারিয়া চাঁপা রঙের শাড়ি পরে আছে, এখন দেখি শাড়ির রঙ নীল। রোদের আলোয় রঙ বদলে গেল, নাকি প্রকৃতি আমার ভেতর বিভ্রম তৈরি করা শুরু করেছে?

‘হিমু ভাই!’

‘বলো ।’

‘যাবার আগে আপনি কি বলে যাবেন আপনি কে?’

আমি বললাম, মারিয়া, আমি কেউ না। I am nobody ।

আমি আমার এক জীবনে অনেককে এই কথা বলেছি- কখনো আমার গলা ধরে যায়নি, বা চোখ ভিজে ওঠেনি। দুটা ব্যাপারই এই প্রথম ঘটল ।

মারিয়া হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রচণ্ড রোদে আমি হাঁটছি। ঘামে গা ভিজে চপচপে হয়ে গেছে। বড় রাস্তায় এসে জামের ভেতর এসে পড়লাম। কার যেন বিজয়-মিছিল বের হয়েছে। জাতীয় পার্টির মিছিল। ব্যানারে এরশাদ সাহেবের ছবি আছে। আন্দোলনের শেষে সবাই বিজয়-মিছিল করছে,

তারাই-বা করবে না কেন? এই প্রচণ্ড রোদেও তাদের বিজয়ের আনন্দে ভাটা পড়ছে না। দলের সঙ্গে ভিড়ে যাব কি না ভাবছি। একা হাঁটতে ইচ্ছা করছে না। মিছিলের সঙ্গে থাকায় একটা সুবিধা হচ্ছে অনেকের সঙ্গে থেকেও একা থাকা যায়।

কিছুক্ষণ হাঁটলাম মিছিলের সঙ্গে। একজন আমার হাতে এরশাদ সাহেবের একটা ছবি ধরিয়ে দিল । এরশাদ সাহেবের আনন্দময় মুখের ছবি। প্রচণ্ড রোদে সেই হাসি স্নান হচ্ছে না।

মিছিল কাওরান বাজার পার হলো । আমরা গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছি- পল্লীবন্ধু এরশাদ। জিন্দাবাদ!

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আমার পা-খোড়া কুকুরটা আমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। কাওরান বাজার তার এলাকা । সে আমাকে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে আমার পাশে পাশে চলা শুরু করেছে। তার খোড়া পা মনে হচ্ছে পুরোপুরি অচল- এখন আর মাটিতে ফেলতে পারছে না। তিন পায়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আমি বললাম, তিন পায়ে হাঁটতে তোর কষ্ট হচ্ছে না তো?

সে বলল, কুঁই কুঁই কুঁই ।

কী বলতে চেষ্টা করল কে জানে কুকুরের ভাষা জানা থাকলে সুবিধা হতো। আমার জানা নেই, তার পরেও আমি তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগুচ্ছি

'তুই যে আমার সঙ্গে আসছিস আমার খুব ভালো লাগছে। মাঝে মাঝে খুব একা লাগে, বুঝলি? আমার সঙ্গে কী আছে জানিস? পদ্ম-নীলপদ্ম! পাঁচটা নীলপদ্ম নিয়ে ঘুরছি। কী অপূর্ব পদ্ম কাউকে দিতে পারছি না। দেয়া সম্ভব নয়। হিমুরা কাউকে নীলপদ্ম দিতে পারে না ।'

চৈত্রের রোদ বাড়ছে। রোদটাকে আমি জোছনা বানানোর চেষ্টা করছি। বানানো খুব সহজ- শুধু ভাবতে হবে- আজ গৃহত্যাগী জোছনা উঠেছে- চারদিকে থৈথৈ করছে জোছনা । ভাবতে

ভাবতেই একসময় রোদটাকে জোছনার মতো মনে হতে থাকবে । আজ অনেক চেষ্টা করেও তা পারছি না। ক্লান্তিহীন হাটা হেঁটেই যাচ্ছি- হেঁটেই যাচ্ছি।